আনন্দমেলা

১১ অগাস্ট ১৯৮২
২.০০
আনন্দবাজার-প্রকাশন

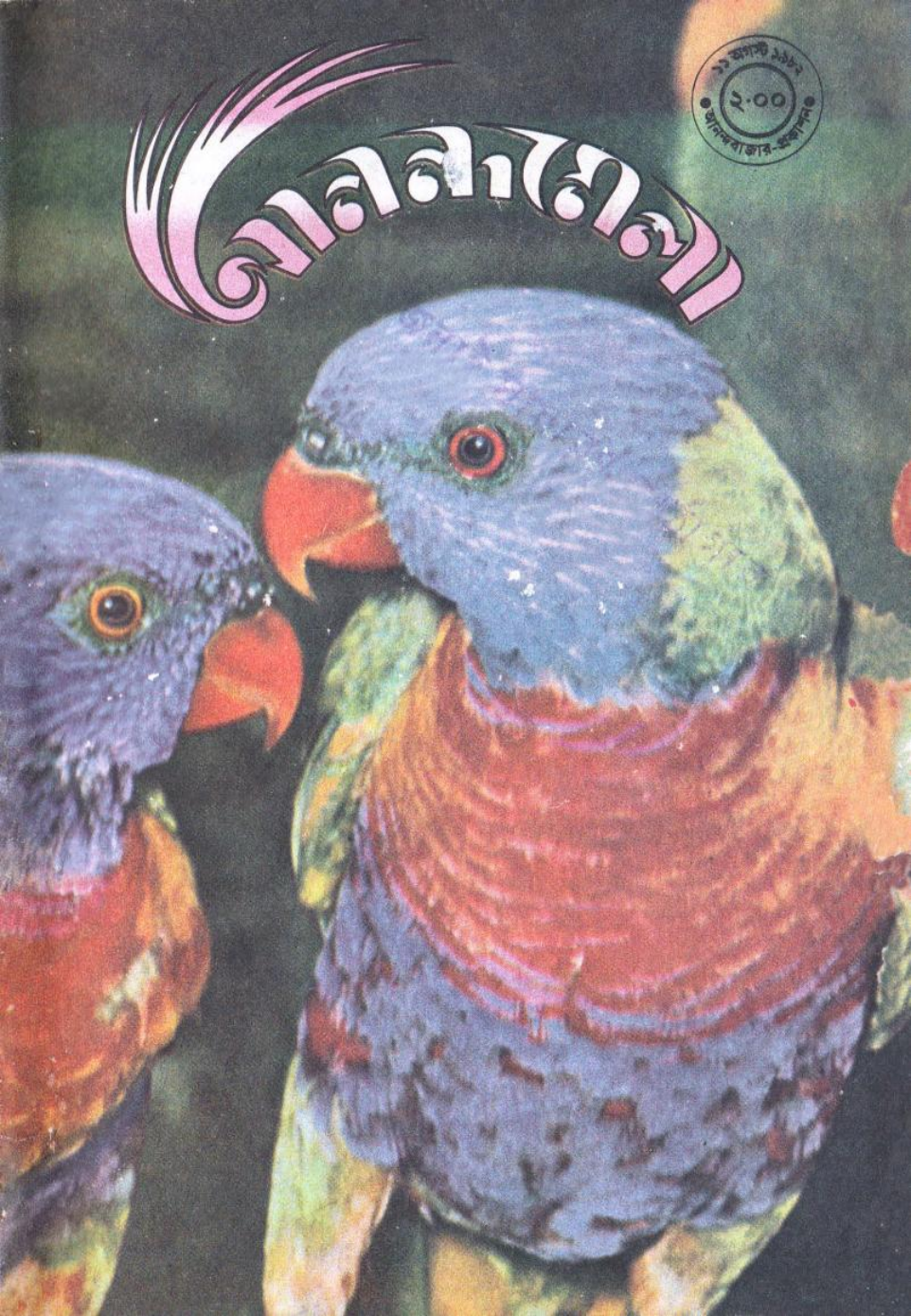

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি - শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী (সোমনাথ দাসগুপ্ত)

স্ক্যান ও এডিট - অপ্তিমাস প্রাইম

যোগাযোগ

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

ঝরঝরে তরতাজা হ'য়ে উঠুন

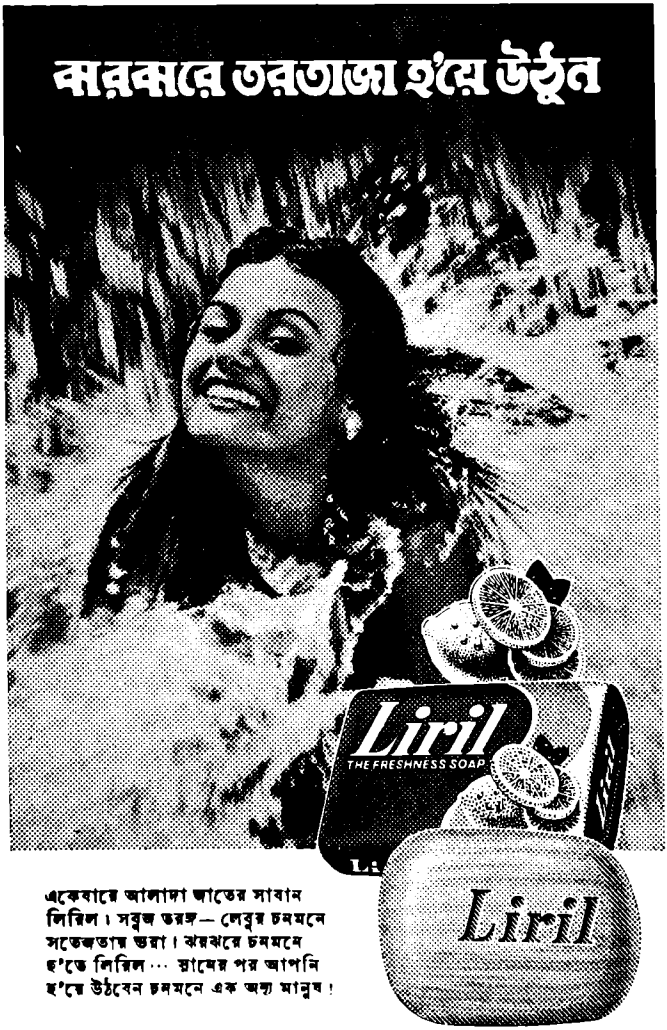

একেবারে আলাদা জাতের সাবান
লিরিল। সবুজ তরঙ্গ— লেবুর চনমনে
সতেজতায় ভরা। ঝরঝরে চনমনে
হ'তে লিরিল··· স্নানের পর আপনি
হ'য়ে উঠবেন চনমনে এক অন্য মানুষ!

লিরিল
তরতাজা করার সাবান

লেবুর মত চনমনে তরতাজা

লিনটাস - LR.27.1810

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

আনন্দমেলা

২৬ শ্রাবণ ১৩৮৯ ● ১১ অগস্ট ১৯৮২ ● ৮ বর্ষ ● ৯ সংখ্যা

গল্প ও বড়গল্প

সতি৷ ভূতের গল্প । বিমল কর ৬ সুব্রত ও দুই খুদে গোয়েন্দা । অশেষ চট্টোপাধ্যায় ২১

উপন্যাস

জঙ্গলগড়ের চাবি । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১১ রুআহা । বুদ্ধদেব গুহ ৩৭

স্মৃতিকথা

বসু-বাড়ি । শিশিরকুমার বসু ৪৫

ছড়া ও কবিতা

বানানের ছড়া । দেব সেনাপতি ৫ এই বর্ষায় । রথীন্দ্র কর ২৩
খানাপিনা । সরল দে ৫০ দরবেশ । ঝুমকা ভাদুড়ী ৫০

খেলোয়াড়ের আত্মকথা

উইং থেকে গোল । প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (পি· কে·) ২৭

চিত্রকাহিনী ও কমিক্স

ফ্লাশ গর্ডন ১৫, রোভার্সের রয় ১৬, সদাশিব ১৮ টারজান ৩১, টিনটিন ৩৪, গাবলু ৫১, বাঘা ৬৩

লেখাপড়া

নরেন্দ্রপুরের মনোজ । বাণীব্রত চক্রবর্তী ৫২

খেলাধুলো

এই নিয়ে তিনবার । শ্যামসুন্দর ঘোষ ৫৪ ইংল্যাণ্ড রাবার জিতল । মণীশ মৌলিক ৫৯
জিমি-জনের যুদ্ধ । অশোক রায় ৬১ ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান । মণি শর্মা ৬২

অন্যান্য আকর্ষণ

ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩২, ছবির মজা ৪৩, তোমাদের পাতা ৬৫

আগামী সংখ্যায়

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখা তাক-লাগানো কল্পবিজ্ঞানের-কাহিনী

রুমাল

বিশ্বকাপ-ফুটবলের প্রচুর ছবি, প্রচুর লেখা

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত । দাম দু' টাকা
বিমান ম. শুল : ত্রিপুরা ৫ পয়সা । পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

ত্বক সুন্দর নির্মল, নববধূ সম উজ্জ্বল!
ক্লিয়ারাসিল ব্রণর মুখ খোলে,
পরিষ্কার করে আর ছড়িয়ে পড়া রোধ করে।
ব্রণ বেরোলে অনেকেই তো অনেক রকম উপদেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু কাজের উপদেশের জন্যে শুনুন পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কিশোর কিশোরীরা ক্লিয়ারাসিলের উপকারীতা সম্বন্ধে কি বলেন। ক্লিয়ারাসিল...নিরাপদ আর সুবিধেজনক ওষুধ–যার বিশেষত্বই হ'ল আপনার ব্রণর সমস্যার সমাধান করা। এখন ক্লিয়ারাসিলের সাহায্যে কতখানি ব্রণ পরিষ্কার আর রোধ করবেন তা আপনার ওপর নির্ভর করছে।
কি ক'রে দেখুনঃ
• প্রতিদিন সকালে আর সন্ধ্যেয় ক্লিয়ারাসিল ব্যবহার করুন।
• ক্লিয়ারাসিল সারা মুখে লাগান। ব্রণর জায়গায় একটু বেশী পরিমাণে লাগান।
• ব্রণ পরিষ্কার হয়ে গেলেও ক্লিয়ারাসিল ব্যবহার করতে থাকুন কারণ ক্লিয়ারাসিল অতিরিক্ত তেলাভাব শুষে নিয়ে ব্রণ রোধ করে।
অদ্বিতীয় ৩-ভাবে ক্রিয়া
শুধু ক্লিয়ারাসিলই তিনভাবে কাজ করে।
১। ব্রণর মুখ খুলে দেয়—ক্লিয়ারাসিলের বিশেষ ফরমুলেশন ব্রণর মুখ খুলতে সাহায্য করে।
২। ব্রণ পরিষ্কার ক'রে দেয়—ব্রণর ময়লা বার ক'রে দিতে সাহায্য ক'রে, ফলে ক্ষতিকর-ভাবে টিপে বার করতে হয় না।
৩। ব্রণ শুকিয়ে দেয়—অতিরিক্ত তেলাভাব শুষে নিয়ে ব্রণ পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।
Clearasil
Clearasil
মুখখানিতে ফুটে উঠলে স্নিগ্ধ লাবণ্য, জীবনের প্রতিপল মনে হবে ধন্য!
বিশ্বের "১" নম্বর ব্রণর ক্রীম
OBM 2115R BN

বানানের ছড়া

দেব সেনাপতি

ষ

অধমের ভ্রাতুষ্পুত্রী
মনীষার পুতুলের বিয়ে,
তার অনুষঙ্গ-ব্যয়
পরিষ্কার পাঁচ-ছটি টাকা।
বরপণ ষোলো আনা
সেটি আবিষ্কার করে নিয়ে
বিষম বিবাদ বাধে
দুর্বিষহ। কন্যাকর্তা কাকা
আমি নিষ্করুণ নই—
বরপণ দিলাম মিটিয়ে।

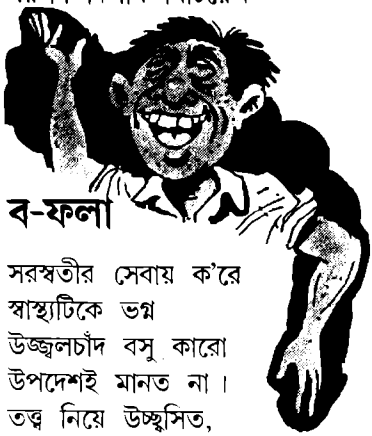

ব-ফলা

সরস্বতীর সেবায় ক'রে
স্বাস্থ্যটিকে ভগ্ন
উজ্জ্বলচাঁদ বসু কারো
উপদেশই মানত না।
তত্ত্ব নিয়ে উচ্ছ্বসিত,
দ্বন্দ্বে সদাই মগ্ন,
বলত, 'সবাই পঙ্ক পাগল।'
ওইটি তাহার সান্ত্বনা,
নিজেও যে ওই স্বতন্ত্র জীব,
সেই কথাটি জানত না।

য-ফলা

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে
অচিন্ত্য মোক্ষের চিন্তা করে।
যদ্যপি দারিদ্র্য তার ঘরে,
অচিন্ত্য পরম ভক্তিভরে
গুরুর মাহাত্ম্যকথা পড়ে।
ভক্তির বৈশিষ্ট্য বুকে ধ'রে
ধর্মের বৈচিত্র্য ভেবে মরে,
মুক্তির ব্যুৎপত্তি যদি মেলে।
উত্ত্যক্ত হয় সে কাছে গেলে,
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে।

স্ত

সংসারে পরাস্ত আজ,
বিপর্যস্ত অভ্যস্ত জীবন।
জ্ঞাতি-বন্ধু অবিশ্বস্ত,
বার্ধক্যে প্রশস্ত শুধু বন।

স্থ

দুঃস্থ গৃহস্থের ছেলে—
বোঝে না সে স্থানাঙ্ক জ্যামিতি
অস্থিসার অসুস্থ সে,
মুখস্থবিদ্যায় বড় ভীতি।

ছবি : দেবাশিস দেব

সত্যি ভূতের গল্প

বিমল কর

সারদাচরণ বকসির নাম তোমরা নিশ্চয় শোনোনি। আমরা ছেলেবেলায় শুনেছিলাম। তখন সারদাচরণকে বলা হত গোয়েন্দা সারদা। উনি লহরী সিরিজের ছ' আনা দামের বইগুলোতে হামেশাই দেখা দিতেন। 'মারাকানার গুপ্তধন', 'তিন প্রহরে ঘন্টা বাজে', 'পরশুরামের পিস্তল'—এ-সব ছিল তাঁর বিখ্যাত বই। তবে সারদাচরণের আসল খ্যাতি ছিল ভূতের গল্প লেখায়। প্রায় প্রত্যেকটি কাগজেই তাঁর ভূতের গল্প বেরুত। দারুণ গল্প। অমন গল্প কেউ আর লিখতে পারত না। এক-একটা গল্প পড়ার পর দিন-দুই গা ছমছম করত।

সারদাচরণ যে কবে লেখাটেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন তা জানতাম না। আর মানুষের ছেলেবেলা তো বরাবর থাকে না, আমরাও বড়সড় হয়ে চাকরি-বাকরি করতে লাগলাম।

ঘটনাচক্রে সারদাচরণের সঙ্গে আমার আলাপ হল সেদিন। ঝাড়গ্রামে গিয়েছিলাম একটা কাজে। সারদাচরণের বাড়ির এক পাশেই আমায় থাকতে হয়েছিল। সেই সূত্রেই আলাপ, তারপর কথায়-কথায় ধরা পড়ে গেলেন এই সারদাচরণই সেই গোয়েন্দা সারদাচরণ। বৃদ্ধ মানুষটি এত চমৎকার, আর গল্প-গুজবে এমন পাকা যে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে গল্প হচ্ছিল। কার্তিক মাসের ঠাণ্ডা পড়েছে সামান্য। সন্ধে হয়ে গিয়েছিল

কথায়-কথায় আমি বললাম, "আপনি ভূতের গল্প লেখা কবে ছাড়লেন?"

"অনেক কাল আগে।"

"ছাড়লেন কেন? দারুণ লাগত আপনার ভূতের গল্প। দু-একটার কথা এখনও মনে আছে।"

সারদাচরণ হাসলেন। বললেন, "কেন ছাড়লাম জানো? একবার এক অদ্ভুত কাণ্ড হল। সেই থেকে ছেড়ে দিলাম।"

"কী কাণ্ড?"

"শুনতে চাও?"

"বাঃ, শুনব না কেন? আপনি বললেই শুনব।"

সারদাচরণ একটু চুপ করে রইলেন। তারপর শুরু হল তাঁর গল্প :

সেটা নাইনটিন ফরটি-টুয়ের গোড়া হবে। তখন সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পিক্ পিরিয়ড। কলকাতা থেকে লোকজন সব পালিয়ে গিয়েছে বোমার ভয়ে। খাঁ-খাঁ করছে শহর। ব্ল্যাক-আউটের চোটে

কলকাতা সন্ধে হতে না হতেই অন্ধকার। ঠুঙি-পরানো গ্যাসের আলো জ্বলে রাস্তায়—তাও সিকি মাইল অন্তর। আমি কিন্তু কলকাতা ছেড়ে পালাইনি। কেমন করে পালাব বলো ? পেট চালাতে হবে তো ! পল হ্যামলিন কোম্পানিতে চাকরি করি, তারা খুব কড়া ধাতের। থাকতাম শীলবাবুর হোটেলে। মির্জাপুর স্ট্রিটে। চাকরি করি, লহরীর ছ' আনা সিরিজের বই লিখি, আর বাচ্চাদের কাগজে গল্প। ভূতের গল্পই বেশি। বড়দের কাগজেও লিখেছি দু-চারটে।

একদিন হোটেল থেকে বেরিয়ে খানিকটা পায়চারি করে কলেজ স্কোয়ারে গিয়ে বসলাম। একটু-একটু চাঁদের আলো, শীত পালাই-পালাই করছে, বেশ লাগছিল। আমার বরাবরই চুরুট খাবার অভ্যেস। নতুন একটা চুরুট ধরিয়েছি এমন সময় কে যেন এসে পাশে বসল।

কলকাতায় তখন সন্ধের পর লোকজন বড় একটা বেরুত না। কোথায় বা যাবে অন্ধকারে। পাড়ার মধ্যেই সিনেমা-থিয়েটারে যেত, বা বন্ধু-বান্ধবের কাছে। কলেজ স্কোয়ার একেবারেই ফাঁকা। দু-চারজন, আমারই মতন আছে হয়তো, চোখে পড়ে না।

পাশে এসে যে লোকটি বসল তাকে আমি নজর করলাম। লিকলিক করছে রোগা, গায়ের রঙ কালোই মনে হল। লম্বা ধরনের একটা জামা পরেছে। সেটা কোট না আলখাল্লা বুঝতে পারছিলাম না।

একটু আলাপ জমাবার চেষ্টা করলাম। লোকটা জবাবই দেয় না কথার, শুধু হ্যাঁ আর না। মনে হল, লোকটা ভীষণ বিরক্ত হয়ে রয়েছে।

আমারও কেমন জেদ ধরে গেল। লোকটাকে কথা না বলিয়ে ছাড়ব না। তাকে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগলাম, আজে-বাজে যা মুখে এল, লোকটারও সেই একই রকম জবাব, হ্যাঁ আর না।

আমি যখন হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিচ্ছি তখন লোকটা আমায় চমকে দিয়ে একটা কথা বলল। কী বলল, জানো ?

বলল, আমাকে সে জানে। আমার নাম সারদাচরণ বকসি। আমি শীলবাবুর হোটেলে থাকি।

শুনে আমি অবাক। লোকটা কি গোয়েন্দা নাকি !

তারপরই লোকটা বলল, 'আপনি মশাই যা জানেন না তা লেখেন কেন ? ফাজলামি পেয়েছেন ?'

আমি একেবারে বেইজ্জত। বলে কী লোকটা। চটেমটে বললুম, 'আমি কী লিখি বলুন তো ?'

'যত্ত ছাই-পাঁশ।'

শুনলে কথা ! রাগে গা জ্বলে উঠল। মনে হল, এক চড়ে লোকটার বদন বিগড়ে দিই। একেবারে অসভ্য। কোনো রকমে রাগ চেপে বললাম, 'মশাইয়ের কি ছাই তোলার অভ্যেস আছে ?'

'আমার কী আছে না আছে আপনার জেনে দরকার নেই।...বেশ তো করে খাচ্ছিলেন তিন রাতে তিন খুন, মৃত্যুফাঁদ লিখে—গল্পের গোরু তরতর করে গাছে উঠছিল; তা মরতে আমাদের দিকে হাত বাড়ালেন কেন ?'

রাগে পিত্তি জ্বলছিল। আমার আবার বদ-অভ্যেস ছিল। রাগের মাথায় তিন পয়েন্ট পাঁচ পয়েন্টও চালিয়ে দিতাম—মানে ঘুসি। কিন্তু রাগ হলেও লোকটার কথাবার্তা শুনে একটু ঘাবড়েও যাচ্ছিলাম। বললাম, 'আপনাদের দিকে হাত বাড়ালাম মানে ?'

'একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা সাজছেন যে ! বলি এই সেদিন রঙবাহার কাগজে কী লিখেছেন ওটা ? ভূত বলে তার জাত নেই—যা খুশি করলেই হল ? কোথায় আপনি দেখেছেন ভূতে রিকশা টানছে ? ছি ছি, বলিহারি আপনার আক্কেল মশাই, রাত একটায়—অমন শীতের দিনে আপনি

"নিখুঁত পরিষ্কার"

"হুইল যে কি জিনিষ, আমার বৌমাটি তো তা জানতোই না। এইসব নতুনের দলেদের কি আর বলব, এখনও সেই পুরোনপন্থী হয়েই রয়েছে! হুইল-এ যে কত সাশ্রয় হয় তা ওকে বোঝালাম—আর এও বললাম যে, প্রতিটি বার-এ চারটি ক'রে ভাগ থাকে। আর তারপর ও এই বিপুল ফেনার রাশি আর কাপড়ের সমস্ত ময়লা ধুয়ে বেরিয়ে যেতে দেখে তো একেবারে অবাক! হুইল-এ কাপড় কাচলে কাপড় পরিষ্কারও হয় সাবানের চেয়ে বেশী আর কাপড় ধোয়াও যায় অনেক বেশী! তাই তো এখন হুইল-এর ওপর ওর দারুণ বিশ্বাস জন্মে গেছে—সাবানের আর দরকারটাই বা কি বলুন তো?"

হুইল

দারুণ ধোলাই শক্তি- চড়া দাম থেকে মুক্তি!

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-WL.12-1810 BG

ভূতকে দিয়ে নিমতলা স্ট্রিট থেকে বেলগেছে পর্যন্ত রিকশা টানালেন ! আপনি নিজে পারবেন টানতে ? দেড় দু-মাইল রাস্তা...ছি ছি ছি... ।'

আমি একেবারে থ' হয়ে গেলাম লোকটার কথা শুনে । কথাটা তো মিথ্যে বলেনি । একেবারে হালে রঙবাহার পত্রিকায় আমার একটা ভূতের গল্প বেরিয়েছে; তাতে বাস্তবিকই এক ভুতুড়ে রিকশা আর রিকশাঅলার কথা রয়েছে ।

রাগ একটু কমল । বললাম, 'কেন, ভূতে রিকশা টানতে পারে না ?'

'না । কভি নেহি...আপনি মশাই বড় বেএক্কেলে । নিজে ফুসফুস করে চুরুট ফুঁকছেন—কই আমাকে তো ভদ্রতা করে একটা দিচ্ছেন না ? একটা চুরুট ছাড়ুন ।'

এবার আমার হাসি পেল । আচ্ছা মজার লোক তো !

একটা চুরুট তাকে দিলাম । দেশলাইও ।

লোকটা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চুরুটটা ধরিয়ে নিল ।

আমি বললাম, 'আপনি আমার গল্প-টল্প পড়েন ?'

'বাধ্য হয়ে ।'

'কেন বাধ্য হয়ে কেন ?'

'ওটা আমার চাকরি ।'

'আপনি কি রঙবাহার কাগজে কাজ করেন ? রণদাবাবুর...'

'না না, রণদা-টনদার আমি কিছু নয় । ওই রণদাবাবুকেও একদিন শিক্ষা দিতে হবে । বাপের পয়সায় কাগজ করে গাধাটা সম্পাদক হয়েছে । ওর বাবা গঙ্গাবাবু প্রায়ই দুঃখ করে বলেন, ছেলেটার কপালে অশেষ দুর্গতি লেখা আছে ।'

বলে কী লোকটা ? রণদাবাবুর বাবা মারা গিয়েছেন বছর কয়েক, তাঁর সঙ্গে এই লোকটার দেখা হবার কথা নয় । ডাহা মিথ্যে বলছে । বললাম, 'রণদাবাবুর বাবা তো স্বর্গে !'

'আমি কি মর্ত্যে থাকার কথা বলেছি ! মায়ের কাছে মামারবাড়ির গল্প !'

লোকটার কথাবার্তা থেকে মনে হচ্ছিল, ও যেন আমাকে ধমকাবার জন্যেই এসেছে । বলতে যাচ্ছিলাম, রণদাবাবুর বাবার সঙ্গে আপনার কি কোনো টেলিফোন কানেকশান আছে ?—আমাকে কথা বলতে না দিয়ে লোকটা বলল, 'ক'দিন আগে বেণুবীণা কাগজে আপনি কী অখাদ্য লেখাই লিখেছেন ! ছ্যা ছ্যা । রেল স্টেশনের ওয়েটিংরুমে ভূত ঢুকিয়েছেন । তাও আবার গোসলখানায় । কেন মশাই, ভূত কি রেলের জমাদার না ঝাড়ুদার ? আপনার মতো নিরেট মাথা আর দেখিনি ।'

আমি হাঁ করে লোকটাকে দেখতে লাগলাম । অন্ধকারে যেটুকু ঝাপসা জ্যোৎস্না ফুটেছে তাতে তাকে অস্পষ্টই দেখাচ্ছিল । লোকটা দেখি টপাটপ্ গল্প বলে দিচ্ছে । হঠাৎ আমার মনে হল, রঙবাহার আর বেণুবীণা—কাগজ দুটো আলাদা হলেও ছাপা হয় একই প্রেসে । লোকটা নিশ্চয় ছাপাখানার লোক । ছাপাখানায় কাজ করে ।

'আপনি কি প্রেসে কাজ করেন ? কম্পোজিটার ?' আমি বললাম ।

'কম্পোজিটার— ! কেন ?'

'না, বলছিলাম—মানে ছাপাখানার কম্পোজিটার হলে তাকে সবই পড়তে হয় । আপনি পটাপট এত গল্পের কথা বলে যাচ্ছেন— ।'

'চ্যাঙড়ামি করছেন ?' লোকটা খেঁকিয়ে উঠল । 'কম্পোজিটার ! আপনার সব ক'টা ভূতের গল্পের ভূতদের কথা আমি বলে দিতে পারি । বলব ?' বলে লোকটা চুরুটে গোটা-পাঁচেক টান মারল । কাসল খকখক করে । তারপর বলল, আপনার একটা ভূত ট্রাফিক পুলিশের কাজ করেছে লোয়ার সারকুলার রোডে, তার জন্য দুটো বাস

মুখোমুখি ধাক্কা লাগিয়েছে। এ-রকম হয় না। ভূতরা মানুষের মতন অত বাজে ট্রাফিক পুলিশ হয় না। আপনি আর-একটা যা কাণ্ড করেছেন, লাশকাটা ঘরে একটা ভূতকে দিয়ে অনবরত হা-হা হি-হি করে হাসিয়েছেন, ভূতরা আপনাদের মতন হ্যা-হ্যা করে হাসে না, তারা দাঁত বার করে হাসতে শেখেনি। লাশকাটা ঘর দেখেছেন কখনো জন্মে ? তার গন্ধ শুঁকেছেন ! গল্পটা পড়ে আপনাকেই কাটতে ইচ্ছে করছিল।...আপনি অদ্ভুত লোক মশাই, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোর মতন—যত রাজ্যের বাজে নোংরা কুচ্ছিত কাজ ভূতদের দিয়ে করিয়েছেন। যেন মানুষরা কত ভাল, তারা সব ভাল ভাল কাজ করে। বোলপুরের সেই গল্পটায় একটা বুড়ো ভূতকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে আপনি তেলেভাজা খাইয়েছেন, আর নিজেরা খেয়েছেন ওমলেট। তার রেজাল্ট কেমন হয়েছিল মনে আছে তো ? কলেরা হতে হতে বেঁচে গিয়েছেন ! ...আপনি খুবই বাজে লোক। ভূতকে দিয়ে সংস্কৃত বলিয়েছেন। পৃথিবীতে কোনো ভূতই দু-তিনটে ভাষা বলতে পারে না। সংস্কৃত পারে না, পুস্তু পারে না, জার্মান পারে না। কেন পারে না জানেন না, আপনাকে জ্ঞান দেওয়া বৃথা। আপনি গবেট টাইপের। যাকগে, দুটো কথা বলতে এসেছি, বলে চলে যাই। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

আমি চুপ। মুখে কথা আসছিল না।

লোকটা বলল, 'শুনুন। যা বলছি তার অন্যথা করবেন না। খুন, পিস্তল, গুমখুন—এ-সব নিয়ে যত খুশি লিখুন, কেউ কিছু বলতে আসছে না। কিন্তু ভূত নিয়ে নয়। আপনারা বাঙালি লেখকরা ভূত নিয়ে ভেলকির গল্প ফাঁদছেন, না-হয় হাসি-মশকরা করছেন। সাহেবরা এমন নোংরা কাজ করে না। তাদের ভূতরা ভদ্রলোক। দু-চারটে হাই ক্লাসের ভূতের গল্প মেরে লিখলেও তো পারেন ! যত্ত সব... ! আচ্ছা চলি, অনেক দূর যেতে হবে। তবে যা বললাম মনে রাখবেন। আর ভূতের গল্প লিখবেন না। লিখলে এমন শিক্ষা পাবেন যে নবাবের মতন পার্কে বসে বসে চুরুট ফুঁকতে হবে না।'

লোকটা উঠে দাঁড়াল।

তাড়াতাড়ি বললাম, 'আপনার পরিচয়, স্যার ?'

'পরিচয় ! আমার পরিচয়, আমি ভূতদের রিপ্রেজেনটেটিভ। দূত বলতে পারেন। ওখানকার সেনসার অফিসের একজন জুনিয়ার অফিসার। সদ্য গিয়েছি। আরে মশাই, গত বছর মিলিটারিতে চাকরি পেয়েছিলাম। ফোর্ট উইলিয়ামে আমার পোস্টিং ছিল। মিলিটারি সেনসার অফিসে। এক হুদো আর্মি অফিসার আমায় তার ট্রাকে চাপা দিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চত্ব। ও সাইডে যেতেই ওরা আমাকে ওদের সেনসার অফিসে কাজে বসিয়ে দিল। ...যাক্‌গে, চলি। আপনি ভূতদের মান-সম্মান ইজ্জত তো নষ্ট করেছেনই, তার ওপর বাচ্চা-কাচ্চারাও যে ভূতকে শ্রদ্ধার চোখে দেখবে—তারও বারোটা বাজিয়েছেন। আমায় বলা হয়েছিল—আপনাকে ওয়ার্নিং দিয়ে দিতে। সাবধান করে দিলাম আপনাকে। আচ্ছা চলি !'

লোকটা চলে গেল।

আমি হাঁ করে বসে থাকলাম।

সারদাচরণ তাঁর গল্প শেষ করলেন।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, "লোকটা কে ?"

"জানি না বাপু ! তবে ভূতের গল্প আর লিখিনি।"

"ভয়ে ?"

"না না ভয়ে নয়। মনে হল, আমি ভূতের গল্প লিখলে লোকটার অন্ন মারা যাবে।" সারদাচরণ হেসে উঠলেন।

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

জঙ্গলগড়ের চাবি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : কাকাবাবুকে গুলি করে পালিয়েছিল আততায়ীরা। অনেক চিকিৎসায় কাকাবাবু বেঁচে উঠলেও পঙ্গু হয়ে গেলেন। হাত নাড়তে পারেন না। নিজে খেতেও পারেন না। এমনকী কাকাবাবুর মাথারও গোলমাল দেখা দিয়েছে, ওঁর অনেক কথাই বুঝতে পারা যায় না। কাকাবাবুর স্বাস্থ্য সারাবার জন্য তাঁকে আসরতলায় নিয়ে এসে সন্তু খুব বিপদে পড়ে গেছে। কাকাবাবু ওকে চিনতেই পারছেন না। এদিকে ডলি নামে একটি তরুণী মেয়ে এসে পরিচয় দিল যে, সে সন্তুর মাসতুতো বোন। সে কাকাবাবু আর সন্তুকে তাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে চায়। সেই সময়ই ত্রিপুরার দুজন সরকারি অফিসার এসে পড়লেন, তাঁরা বললেন ডলির আসল নাম চামেলি, সে একটি জেল-খাটা মেয়ে। সন্তুর সঙ্গে প্রকাশ সরকার নামে একজন ডাক্তার এসেছিলেন, তাঁকেও ভোর থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। এরপর—

॥ ১ ॥

সন্তুর ধারণা হল বাইরে গিয়ে সে ডক্টর প্রকাশ সরকারকে দেখতে পাবে। কারণ ভোর থেকে প্রকাশ সরকারের উধাও হয়ে যাবার সে কোনো যুক্তিই খুঁজে পাচ্ছে না।

কিন্তু বাইরে এসে দেখল, একটা সাইকেল-রিকশার ওপর একজন সম্পূর্ণ অচেনা লোক গা এলিয়ে শুয়ে আছে। দেখলে মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। লোকটির গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি আর ধুতি, পায়ের চটিও বেশ দামি। কিন্তু লোকটির চেহারার সঙ্গে এই পোশাক যেন একেবারেই বেমানান। লোকটির গায়ের রং পোড়-পোড়া, মুখে পাঁচ-ছ'দিনের খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, মাথার চুল উস্‌কো-খুস্‌কো।

শিশির দত্তগুপ্ত আর অরিজিৎ দেববর্মনও লোকটিকে চিনতে পারলেন না।

সাইকেল-রিকশা-চালকটি হতভম্ব মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।

শিশিরবাবু প্রথমে শুয়ে-থাকা লোকটির হাত ও বুক পরীক্ষা করে দেখলেন যে সে বেঁচে আছে কি না। তারপর রিকশাচালককে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার, একে কোথায় পেলে?"

রিকশাচালক বলল, "বাবু, আমি তো কিছুই বুঝতে পারতেছি না। ফিশারি অফিসের ধার থেকে দুটি বাবু কাঁধ ধরাধরি করে উঠলেন। আমারে হেঁকে বললেন, সার্কিট হাউস চলো! খানিক বাদে আমি একবার পিছু ফিরে দেখি এক বাবু নেই। আর এক বাবু এরকমধারা এলিয়ে পড়ে আছেন।"

"একজন মাঝপথ থেকে নেমে গেল, তুমি টেরও পেলে না?"

"না, বাবু! আমি তো আগে আর পেছুন ফিরে তাকাইনি!"

"কিন্তু গাড়ি তো হালকা হয়ে গেল। তা ছাড়া একজন লোক নেমে গেলে গাড়িতে একটা ঝাঁকুনিও তো লাগবে?"

"মাঝখানে এক জায়গায় রাস্তা খারাপ ছিল, সেখানে এমনিতেই তো গাড়ি লাফাচ্ছিল!"

"যে-লোকটি নেমে গেছে, তাকে দেখতে কেমন মনে আছে?"

"জামা আর প্যান্টুলুন পরা এমনি সাধারণ ভদ্দরলোকের মতন!"

"আর এই লোকটি কি তখন নিজে থেকেই তোমার রিকশায় উঠেছিল?"

"অন্য বাবুটির কাঁধ ধরাধরি করে এল। আমি ভাবলুম বুঝি শরীর খারাপ।"

সন্তু বলল, "চামেলি এই লোকটিকে চেনে কি না একবার দেখলে হয়!"

শিশিরবাবু বললেন, "এমনও হতে পারে, এই লোকটির সঙ্গে মিঃ রায় চৌধুরীর কেসের কোনো সম্বন্ধই নেই। এ হয়তো সার্কিট হাউসের অন্য ঘরে থাকে। যাই হোক, দেখা যাক্।"

ধরাধরি করে লোকটিকে নিয়ে আসা হল সার্কিট হাউসের অফিস-ঘরে। ম্যানেজার কিংবা দরোয়ান কেউ-ই লোকটিকে চেনে না।

সন্তু গিয়ে চামেলিকে ডেকে আনল। অরিজিৎবাবু রইলেন কাকাবাবুর কাছে।

চামেলি লোকটিকে দেখে বলল, "ও মা। এ আবার কে? একে তো কখনো দেখিনি!"

শিশিরবাবু সার্কিট হাউসের ম্যানেজারকে বললেন লোকটিকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দিতে। একজন পুলিশ সেখানে রেখে দিলেন লোকটিকে পাহারা দেবার জন্য।

কাকাবাবুর ঘরে ফিরে এসে সন্তু জিনিসপত্র সব গুছিয়ে ফেলল। তাদেরও সার্কিট হাউস ছেড়ে চলে যেতে হবে। শিশিরবাবু এখানকার মহারাজার একটি গেস্ট হাউসে তাদের থাকবার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন।

চামেলি এই সময় বলল, "স্যার, আমি তা হলে এবারে যাই?"

অরিজিৎবাবু বললেন, "তুমি যাবে? কোথায় যাবে?"

"বাড়ি যাব। আমি আর এখন এখানে থেকে কী করব?"

"তোমার আবার আগরতলায় বাড়ি আছে নাকি? আমি তো যতদূর জানি তোমার বাড়ি ধর্মনগরে।"

"না, মানে, এখানে আমার এক বন্ধুর বাড়ি আছে।"

"তোমার বন্ধু কে, তার নামটা তো জানতে হচ্ছে। সেও নিশ্চয় তোমারই মতন।"

শিশিরবাবু বললেন, "একটু আগে তুমি বললে, তুমি কাজ হাসিল না করতে পারলে ওরা তোমায় মেরে ফেলবে। তারপর একটু বাদে বললে, তুমি আগের অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে কাকাবাবুর সেবা করবে। আবার এখন বলছ বন্ধুর বাড়ি যাবে। তুমি দেখছি পাগল করে দেবে আমাদের!"

অরিজিৎবাবু বললেন, "তোমায় আর ছাড়া হবে না। জেলখানাই তোমার পক্ষে ভাল জায়গা।"

চামেলি যেন খুব ভয় পেয়ে গেছে, এইভাবে বলল, "না, না, আমায় আর জেলে পাঠাবেন না। আমার জেলের মধ্যে থাকতে একদম ভাল লাগে না!"

কাকাবাবু আগাগোড়া চুপ করে চোখ বুঁজে বসে আছেন। এসব কথা শুনছেন কি না কে জানে।

শিশিরবাবু এবার বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, উঠুন। এখন আমাদের যেতে হবে।"

সন্তু বলল, "ওঁকে ধরে-ধরে তুলতে হবে। উনি নিজে হাঁটতে পারেন না।"

শিশিরবাবু লজ্জিতভাবে বললেন, "ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো! চলো, তুমি আর আমি ওঁকে ধরে নিয়ে যাই।"

কাকাবাবু এবারেও কোনো কথা বললেন না, ওদের বাধাও দিলেন না।

সার্কিট হাউস ছেড়ে বাইরে যাবার সময় সন্তুর মনে পড়ল ডাক্তার প্রকাশ সরকারের কথা। ভদ্রলোক কোথায় যে গেলেন? এর পর তিনি ফিরে এলেও সন্তুদের খুঁজে পাবেন কি না কে জানে!

শিশিরবাবু একটা স্টেশান ওয়াগন আনিয়েছিলেন। সেটার পেছন দিকে শুইয়ে দেওয়া হল কাকাবাবুকে। তারপর গাড়িটা ছেড়ে দিল।

ত্রিপুরার রাজাদের অনেকগুলো বাড়ি। তার মধ্যেই কয়েকটি বাড়িকে অতিথিশালা করা হয়েছে। সন্তুরা যে-বাড়িটাতে এসে পৌঁছোল, সেটা দেখলে রাজার বাড়ি মনে হয় না। বাড়িটা এমনিতে বেশ সুন্দর, ছোট্টখাট্টো, দোতলা। সাদা রঙের। সামনে অনেকখানি বাগান। মনে হয় কোনো সাহেবের বাড়ি। হয়তো এক সময় কোনো সাহেবেরই ছিল।

সবাই মিলে উঠে এল ওপরে। দোতলায় মাত্র তিনখানা ঘর আর বেশ চওড়া বারান্দা। এর মধ্যে মাঝখানের ঘরটা সন্তুদের জন্য খুলে রাখা হয়েছে।

অরিজিৎবাবু বললেন, "নীচে রান্নার লোক আছে, কেয়ারটেকার আছে, যখন যা চাইবে দেবে। তোমাদের কোনো অসুবিধে হবে না। একজন নার্স পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে সারাক্ষণ থাকবে। আর একজন ডাক্তারও এসে দেখে যাবেন একটু বাদে।"

শিশিরবাবু বললেন, "একতলার ঘরে দুজন পুলিশও থাকবে। অচেনা কোনো লোককে ওরা ওপরে আসতে দেবে না। তোমরাও কোনো অচেনা লোকের সঙ্গে দেখা কোরো না। তোমার কাকাবাবুর এখন একদম চুপচাপ নিরিবিলিতে থাকা উচিত।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "এখানে টেলিফোন আছে? হঠাৎ কোনো দরকার পড়লে খবর দেব কী করে?"

শিশিরবাবু বললেন, "হ্যাঁ। একতলায় টেলিফোন আছে। তা ছাড়া কোনো দরকার হলে আমার পুলিশদের বোলো, ওরাই সব ব্যবস্থা করবে।"

অরিজিৎবাবু বললেন, "আমায় এক্ষুনি অফিসে যেতে হবে। দিল্লিতে সব খবর জানানো দরকার। সন্তু, কলকাতায় তোমাদের বাড়িতে কোনো খবর পাঠাতে হবে?"

একটু চিন্তা করে সন্তু বলল, "না,

থাক।"

শিশিরবাবুরও কাজ আছে, তাঁকেও এখন যেতে হবে। দুজনেই 'আবার বিকেলে আসব' বলে নেমে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে।

বারান্দার একটা ইজিচেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে কাকাবাবুকে। অনেকক্ষণ থেকে তিনি একেবারে চুপ করে আছেন। শিশিরবাবু আর অরিজিৎবাবু এর মধ্যে কাকাবাবুর সঙ্গে দু-একবার কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কাকাবাবু কোনো উত্তর দেননি। এখনো তিনি একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন আকাশের দিকে। কাকাবাবুর বেশ কয়েক কাপ কফি খাওয়ার অভ্যেস সকালবেলা। আজ উনি মোটে এক কাপ চা খেয়েছেন। বেলা এখন প্রায় এগারোটা। সেইজন্য সন্তু কাকাবাবুর কাছে গিয়ে আস্তে জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, কফি খাবেন? আমাদের সঙ্গে কফি আছে, নীচের লোকদের বানিয়ে দিতে বলতে পারি।"

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে মুখ ফেরালেন সন্তুর দিকে। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে তারপর বললেন, "তুমি ...তুই সন্তু না ?"

সন্তু ব্যগ্র ভাবে বলল, "হ্যাঁ, কাকাবাবু !"

"একবার মনে হচ্ছে সন্তু, আর একবার মনে হচ্ছে মিংমা। আমি কিছুই মনে রাখতে পারছি না যে। মাথার মধ্যে সব যেন কী-রকম গোলমাল হয়ে যাচ্ছে !"

এ-কথা শুনেও সন্তু একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কাল রাত্তির থেকে সে কাকাবাবুর মুখে এত স্বাভাবিক কথা আর শোনেনি।

সে বলল, "কাকাবাবু, আপনি কয়েকদিন একটু বিশ্রাম নিন। তা হলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"আমরা কোথায় এসেছি রে ? এই জায়গাটা কোথায় ?"

"এটা ত্রিপুরার আগরতলা।"

"আশ্চর্য ! শেষ পর্যন্ত আমাকে এখানেই নিয়ে এল !

"কেন কাকাবাবু ? এখানে আপনার অসুবিধে হবে ?"

"কী জানি ! আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না !"

কাকাবাবু আবার চুপ করে আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন। সন্তু আর কফি খাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস পেল না।

প্যান্ট-শার্ট ছেড়ে সন্তু একটা পাজামা আর পাঞ্জাবি পরে নিল। তারপর ঘুরে দেখতে গেল সারা বাড়িটা।

অন্য দুখানা ঘরের মধ্যে একটা ঘরে তালা বন্ধ, অন্য ঘরটি খোলা। সেটার দরজা টেনে সন্তু দেখল, ঘরটি বেশ বড়, এক পাশে একটা খাওয়ার টেবিল আর অন্য পাশে কয়েকটা সোফা-কোচ সাজানো। একটা বেশ বড় রেডিও রয়েছে সেখানে। সে-ঘরের দু'দিকের দেওয়ালে দুটো ছবি। একটা ত্রিপুরার আগেকার কোনো মহারাজার, আর একটা রবীন্দ্রনাথের।

তিনতলার একটা সিঁড়ি উঠে গেছে ওপর দিকে। সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে সন্তু দেখল ছাদের দরজার তালাবন্ধ। সন্তু একটু নিরাশ হয়েই নেমে এল। যে-কোনো নতুন বাড়িতে গেলেই তার ছাদটা দেখতে ইচ্ছে করে।

সন্তু নেমে গেল একতলায়।

সিঁড়ির পাশের ঘরটার সামনেই টুল পেতে দুজন সাদা-পোশাকের যণ্ডামার্কা পুলিশ বসে আছে। সন্তুকে দেখেই একজন জিজ্ঞেস করল, "কী, কিছু লাগবে ?"

সন্তু বলল, "না, বাগানটা একটু দেখতে এসেছি।"

বাগানটি বেশ যত্ন করে সাজানো। নিশ্চয়ই মালি আছে। গোলাপ আর জুঁই ফুলই বেশি। সন্তু কক্ষনো ফুল ছেঁড়ে না, ফুল গাছে থাকলেই তার দেখতে ভাল লাগে। সে মুখ নিচু করে এক-একটা ফুলের গন্ধ নিতে লাগল।

বাগানের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে সন্তু অনেক কথা চিন্তা করতে লাগল। সকাল থেকে কত ঘটনাই না ঘটে গেল।

একটা ব্যাপার সন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছে না। প্রথমে তাদের যাবার কথা ছিল পুরী, তারপর হঠাৎ সেই প্ল্যান বদল করে তাকে আর কাকাবাবুকে নিয়ে যাওয়া হল গৌহাটিতে। সেখান থেকে আবার তাদের আনা হল এই আগরতলায়। এক রাত্তিরের মধ্যে এসব ঘটেছে। তবু আগরতলায় এত লোক তাদের কথা জানল কী করে ? আর এখানে তাদের এত শত্রুই বা হল কেন ?

সন্তু এই সব ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটছিল, হঠাৎ একটা বিশ্রী শব্দ শুনে সে চমকে উঠল। কী-রকম যেন স্প্রে করার মতন ফিস্‌স্ ফিস্‌স্ শব্দ। সন্তু সামনে তাকিয়ে দেখল একটা সাপ ফণা তুলে আছে তার দিকে। (ক্রমশ)

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ফ্ল্যাশ গর্ডন

রকেট আকাশে উঠে যাচ্ছে। তার ক্যাপসুলের মধ্যে তিনটি প্রাণী। প্রচণ্ড চাপ পড়ছে তাদের উপরে...
ভেবেছিলুম, মৈত্রীর বাণী নিয়ে মহাকাশে যাব। কিন্তু এখন... এখন তো গ্রহান্তরের প্রাণীরা যুদ্ধে নেমে পড়েছে...
জারকভ, ফ্ল্যাশ আর ডেল, তিনজনেই ধীরে-ধীরে বেহুঁশ হয়ে যায়...
ওদিকে মহাকাশে ধীরে-ধীরে তৈরি হয়ে উঠছে সেই ভয়ঙ্কর গহ্বর, সবকিছুকেই যা গ্রাস করে নেয়। ডঃ জারকভের রকেটও তার কাছে নিষ্কৃতি পাবে না!
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়
রয়ের মানসিক চাপ কমাবার জন্য তাকে সরিয়ে বেন গ্যালোয়েকে দলের ম্যানেজার করা হয়। বেনের বুদ্ধির দৌলতে কারফোর্ডের বিরুদ্ধে রোভার্স জেতে। লিগের খেলায় রোভার্সের এটাই প্রথম জয়।
ম্যানেজার হারিয়ে রয়কে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে!
বেচারা!
খেলাতেও তাই মন নেই!
রয় অবশ্য খানিক আগের টেলিফোন-কলের কথাই ভাবছিল...
বেন আমাকে প্লেয়ার-ম্যানেজার বলল কেন?
নাও!
আমাকে খুশি করবার জন্যে?
আঃ!
দারুণ ট্যাকল!
হারানো পদ কি ফিরে পেলাম?
দারুণ এগোচ্ছে!
এদিকে, রয়!
ব্ল্যাকিকে বল দিয়ে রয় এগিয়ে গেছে!
নাও, রয়! মারো!
গো-ও-ও-ও-ল!
চার সেকেন্ডের মধ্যে গোল! বাস রে!
শাবাশ! শাবাশ!

রোভার্স আজ বাঘের মতো খেলছে···
ম্যাডিনকে বল দিয়েছে রয় !
বোধহয় ব্ল্যাকি এবার বল পাবে !
কেলবার্নের রক্ষণভাগ পিছিয়ে যেতেই···
কী বাঁকানো শট !
ম্যাডিন নিজেই গোল দিয়েছে !
কেলবার্ন এখন ছত্রভঙ্গ
আঃ !
ফাউলটা রেফারি দেখতে পায়নি !
রয় কি ও-বল আর পাবে ?
ঢুকে যা !
অবিশ্বাস্য ! থ্রি নিল !
হাফ-টাইমের আগে আবার গোল করল রয়···
ফের নিল ! রয়, আজ তুমি অপূর্ব খেলছ !
মনে হচ্ছে, একটা সুখবর পাব।
ফোন পেয়ে খুশি হয়েছ তো ?
গুলে বলো !
আমি কি ফের ম্যানেজার ?
নিশ্চয়। ডিরেক্টররা জানে তোমার মূল্য কতখানি।
এবারে একজন কমার্শিয়াল ম্যানেজারও নেওয়া হবে।
আরও ম্যানেজার ?
আমাদের কাছে ম্যানেজার মাত্র একজনই।
শুরু হল দ্বিতীয়ার্ধের খেলা···
কেমন বীরবিক্রমে মাঠে নামছে দ্যাখো !
কেলবার্ন আজ কচুকাটা হবে !
রয় আজ অপ্রতিরোধ্য দুর্ধর্ষ···
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সদাশিব

দৌড়োদৌড়ি কাণ্ড

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার
ছবি : বিমল দাশ

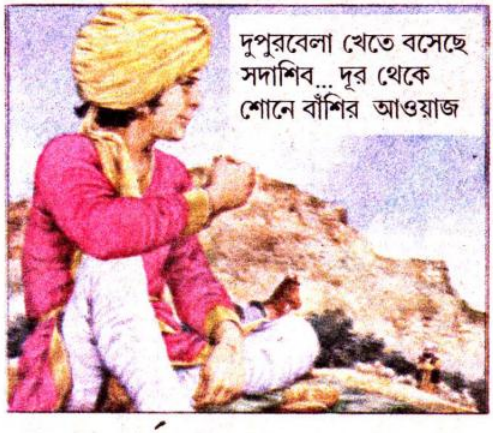

বাঁশি বাজাতে বাজাতে
এগিয়ে আসছে মুসলমান
এক মেষপালক

লোকটি চলে গেলে সদাশিব ভাবে...

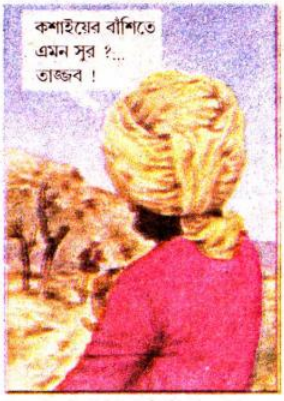

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সদাশিব এক নদীর ধারে পৌঁছল

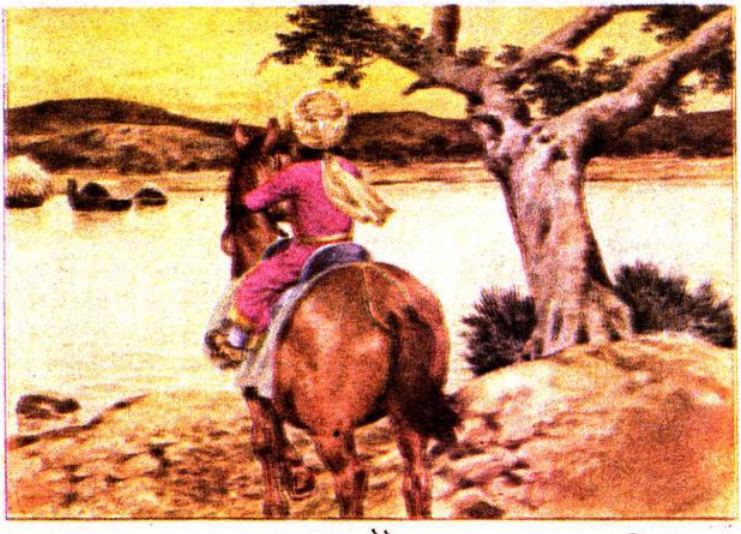

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ফ্ল্যাশের এক ঝলকেই নির্মল, উজ্জ্বল!

কারণ, একমাত্র ফ্ল্যাশেই
এখন মেলানো রয়েছে তরতাজা
স্বাদের আকাশী-নীল উপাদান!

ফ্ল্যাশ
টুথপেস্ট

**ফ্ল্যাশে দাঁত উজ্জ্বল-
ঝলমলে নির্মল!**

ফ্ল্যাশ···এটি দিয়ে দাঁত মাজা শুরু করতে না করতেই, এর নীল রঙা মুখ শুদ্ধিকারক উপাদানটি, আপনার নিঃশ্বাসকে করে তুলবে তরতাজা—আর মুখের ভেতরে রেখে যাবে এক ঝকঝকে পরিষ্কার আর তাজা ভাব! তাই, ফ্লাশ যে মুখের ভেতরে সম্পূর্ণ যত্ন নেওয়ার জন্যে ভিয়েনার ওয়ান্ড সিলেকশান পুরস্কার জিতে নিয়েছে, তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে—কারণ ফ্লাশ-এর যত্নই তো আপনার স্বাস্থ্যে কলমল হাসিকে আরও উজ্জ্বলতায় ভরিয়ে তোলে··· দিনের পর দিন ধরে।

everest/82/FL/81-bn

সুব্রত ও দুই খুদে গোয়েন্দা

অশেষ চট্টোপাধ্যায়

॥ ৩ ॥

যন্ত্রণার কুয়াশার মধ্যে দিয়ে নিজেকে একটু-একটু করে খুঁজে পেল সুব্রত। ডান হাতটা উঠে গেল কপালের বাঁ ধারে। চটচটে ভিজে কী যেন লাগল। একই সঙ্গে বাঁ হাতটা হাতড়াল কোমর বরাবর। হোলস্টারসুদ্ধ রিভলভারটা ঠাঁইনড়া হয়নি। বুঝতে পারল জীপটা একটু কাত হয়ে রয়েছে। চোখে তো অন্ধকারের ফেট্টি বাঁধা। কিছুই দেখা যায় না। কানে এল অজস্র ঝিঁঝির ডাক। পৃথিবী বলে মস্ত জায়গাটার কোন্ ঘুপচি খোঁদলের মধ্যে পড়ে আছে খেয়াল করতে পারল না সুব্রত। মাথার মধ্যে একটা ভোঁতা যন্ত্রণা ঠেলে মন সাড়াশব্দ দিতেই ডান দিকে হাত বাড়াল সুব্রত। সীটের ওপর খানিকটা হেলে - পড়া অক্ষয়কে পেয়ে গেল নাগালের মধ্যে।

"অক্ষয়," সুব্রত ডাকল। এ যেন অন্য কারুর গলা, ভাঙা-ভাঙা। কোনো সাড়া পেল না।

অন্ধকারে ঝিঁঝির ডাক ছাড়িয়ে আর একটা শব্দ কানে পেল সুব্রত। ঘুঙুরের শব্দ। কে যেন ঘুঙুর পরে এগিয়ে আসছে। বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সম্ভব-অসম্ভবের মাঝখানে চিরসন্ধ্যার রাজত্বে নিজেকে একা-একা অল্প সময়ের জন্যে দেখল সুব্রত। কিন্তু মনে পড়ে গেল, যাই ঘটুক না কেন হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে চলবে না।

"কী হল অক্ষয়, লেগেছে তোমার," অন্ধকারে হাতড়ে কাঁধে হালকা ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞেস করল সুব্রত।

নড়েচড়ে উঠল অক্ষয়। টেনে টেনে বলল, "কী যে হয়ে গেল স্যার, বুঝতেই পারলাম না। ডান হাঁটুটায় ভীষণ লেগেছে। বুকেও লেগেছে স্টিয়ারিংয়ের ধাক্কা। আর গাড়িরও বারোটা বেজে গেছে।"

আবার ঘুঙুরের শব্দ। কে যেন ঘুঙুর পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে গাছের গুঁড়িতে হুমড়ি-খাওয়া জীপের আশেপাশে।

"শুনছেন স্যার," অক্ষয়ের গলায় ভয়ের ছোঁয়াচ।

"শুনছি তো, টর্চটা যে কোথায় ছিটকে পড়ল," নিজের পাশে, পায়ের কাছে হাতড়াতে হাতড়াতে বলল সুব্রত।

চারিদিকের গাছগাছালিতে অনেক পাখি নিশ্চয় ঘুমিয়ে ছিল। হঠাৎ এক সঙ্গে ডানা ঝাপটে ডেকে উঠল তারা। সেই দম ধরে থাকা অন্ধকার আরও ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল খিল খিল হাসির শব্দে।

গায়ের লোমগুলো শক্ত আর মোটা হলে সুব্রত শজারু হয়ে যেত। হোলস্টার থেকে রিভলভারটা এক হ্যাঁচকায় চলে এল ডান হাতে।

"কে ওখানে," যতটা সম্ভব সাহস কুড়িয়ে-বাড়িয়ে মরিয়া হয়ে বলল সুব্রত।

"খুবই দেখি ভয় পাইছেন," আর এক রাশ হাসি ছড়িয়ে দিয়ে সুব্রতর হাত-দুইয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে কেউ বলল কথাগুলো, "আর আপনের বলদ ড্রাইভার তো দেখি দুই চক্ষু উলটাইয়া এক্কেবারে শিবনেত্র। এত ভয় পাইলে ডাকাইত ধরবেন ক্যামনে। নাইম্যা আসেন সাহেব, স্তম্ভ মাইর‍্যা বইস্যা থাকবেন না।"

রিভলভারটা বাগিয়ে ধরে জিপ থেকে নামল সুব্রত। বলল, "কে কথা বলছ, সামনে এসো।"

"সামনেই তো আছি আপনার," আর একঝাঁক হাসি ছড়িয়ে গেল অন্ধকারের। আবার ঘুঙুরের শব্দ।

"তোমার সঙ্গে কে," সুব্রতর বুকের মধ্যে দুপদাপ দুরমুশ পেটার আওয়াজ, সারা বুকটা হাপর হয়ে ফুলে উঠে নাক মুখ দিয়ে

বার করে দিচ্ছে বাড়তি বাতাস।

"আমার ছুটো বোন খুকুরানী, আমি গান বান্ধি, গাই, ও আমার গানের সাথে নাচে," চোখে কিছু না দেখলেও শুনতে পেল সুব্রত। সেই ছেলেমানুষি গলাটা আবার ব্যস্ত হয়ে বলল, "দেরি কইরেন না সাহেব, ডাকাইতরা যাইত্যাছে খালের ধার বরাবর। আপনে যত দেরি করবেন, উয়ারা ততই দূরে চইল্যা যাইবগা।"

"তোর নাম কী ? তোকে দেখতে পাচ্ছি না কেন," মাথার বাঁ দিকে হাতুড়ি-পেটা যন্ত্রণা, বুকের মধ্যে দুপদাপ, মনের থেকে কুয়াশার জট ছিঁড়ে ফেলে সুব্রত পুলিশ হবার চেষ্টা করল।

"আমারে সবাই সুনু কয়, বাপ-মায়ে নাম রাখছিল সুনীল। এই আন্ধারে নিজের হাত-পা দেখন যায় না, আপনে কেমন কইর‍্যা দ্যাখবেন আমারে," আলগা হাসির পরতে মোড়া কথাগুলো এল সুব্রতর দু-হাত নাগালের মধ্যে থেকে। "আমি আর খুকুরানীই তো থানায় গিয়া খবর দিলাম। বড়বাবু অমনি ছোটলেন গাড়ি লইয়া। অগো প্রায় ধইর‍্যা ফ্যালছিলেন। অল্পের জন্য পারলেন না। ওরা দৌড় দিল এক দিকে, বড়বাবু গুলি চালাইলেন অন্য দিকে। আন্ধারে গাছে ধাক্কা খাইয়া নাকে খুব ব্যথা পাইছেন বড়বাবু। নাকখান ফুইল্যা মধু ময়রার দোকানের ডবল সাইজের শিঙ্গাড়া হইয়া গ্যাছে," বলতে বলতে গলাটা হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠল, "চলেন, চলেন, আর কথায় কাম নাই।"

হঠাৎ ড্রাইভারের কথা মনে পড়ায় সুব্রত ডাকল, "অক্ষয়।"

"হাঁটুটা বোধহয় ভেঙেই গেছে স্যার, ডান পাটা নাড়তে পারছি না," কোনোরকমে ককিয়ে-ককিয়ে বলল অক্ষয়।

"ফ্যাসাদ বাধালে," সুব্রত দোটানার মধ্যে কয়েক সেকেণ্ড টলমল করে বলল, "তাহলে তুমি থাকো এখানে গাড়ি নিয়ে।" তারপর রিভলভারটা হোলস্টারে পুরে সামনের অন্ধকারকে বলল, "চল্, কোথায় যেতে হবে।"

অমনি সুব্রতর ডান হাতের কবজিটা একটা বরফের হাতকড়ায় আটকা পড়ল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল ঠাণ্ডা ইলেকট্রিক কারেন্ট। চমকে উঠে সুব্রত বলল, "তোর হাত এত ঠাণ্ডা কেন।"

"শীতে গরিব লোকের হাত অমন হইয়াই থাকে," সুব্রতর প্রশ্নটা হেলাফেলা করে ঝেড়ে ফেলে সেই ঠাণ্ডা হাতের

মানিক বলল, "কোনো ভয় নাই, ঠিক পথে আপনারে লইয়া যাইব আমি," একটু থেমে আবার বলল, ভীষণ চাপা রাগে রি-রি করে, "আইজ আর সাহেবজানের রক্ষা নাই।"

"আমাকে একা ফেলে যাবেন না স্যার," অক্ষরের যন্ত্রণায় ডোবানো গোঙানি প্রায় শুনতেই পেল না সুব্রত। বরফের হাতকড়ায় আটকানো ডান হাতটা আর নিজের দখলে নেই। কী, কেন, কোথায়—এই প্রশ্নগুলোও ছাঁটাই মন থেকে। আগে আগে চলেছে ঘুঙুরের শব্দ। উঁচু-নিচু জমিতে পা পড়ছে। গাছের ডাল থেকে থেকে ঘষে যাচ্ছে মুখের ওপর। সুব্রত হেঁটে চলেছে ঘোরের মধ্যে। নিজের শরীর, বুদ্ধিশুদ্ধি কিছুই আর বশে নেই।

"সাহেবজানেরে আজ একেরে শ্যাষ কইর‍্যা ফ্যালান, আপনেই পারবেন, তাই আজ ধরছি আপনারে," সুব্রতর কানের কাছে কথাগুলো হিস-হিস করে উঠল। সেই সঙ্গে বরফের হাতকড়াটা আরও কেটে বসল কবজির ওপর এক লহমার জন্যে।

সুব্রতর প্রায় অসাড় মনে এতক্ষণে একটা প্রশ্ন ঢুঁ মারল। বলল, "সাহেবজানের ওপর তোর এত রাগ কেন।"

জবাবে কথার পেছনে কথা জুড়ে একটা লম্বা মালগাড়ি চলে গেল সুব্রতর কানের পাশ দিয়ে। মনের আধখোলা ঢাকনা গলিয়ে কিছু শব্দ ভেতরে গেল, কিছু গেল না। যা গেল তার টুকরো-টাকরা দিয়ে একটা ভাঙাচোরা, ছাড়া-ছাড়া গল্প। জয়বাংলার সময় সুনু খুব ছোট। বাবা-মায়ের সঙ্গে ওপার থেকে এল এপারে। কী যেন করত সুনুর বাবা। কুমোর ছিল বোধহয়। থিতু হয়ে বসার পর বোনটার জন্ম। হাঁটা-চলা করে বোনটা, কথা বেশ বলতে পারে, কী এক জ্বরে একেবারে বোবা হয়ে গেল। আস্তে-আস্তে ভুলে গেল কথা বলতে। সুনু ছেলেবেলা থেকেই গাইতে পারে, গানও বাঁধে। বোনটাকে সাজিয়ে শহরে, স্টেশনে, রেলগাড়িতে নিয়ে যেত। সুনু গান গাইত, বোনটা নাচত। লোকে খুশি হয়ে পয়সা দিত। একদিন রাত্তিরে দুজনে ফিরেছে শহর থেকে। এসে দেখে মায়ের জ্বর। বাবা হাট থেকে ফেরেনি। বোনটা খিদেয় কাঁদতেই মা তার পিঠে গুম-গুম করে কটা কিল বসিয়ে দিল। কাঁদতে-কাঁদতে রাস্তায় ছুটে এল বোনটা। পেছনে-পেছনে সুনু। ঝড়ের মতো আসছে একটা জীপ। কাশীরাম আগরওয়ালার গদি লুঠ করে পালাচ্ছে সাহেবজান। বোনটা কালা, শুনতে পেল না গাড়ির শব্দ। সুনু লাফিয়ে পড়ে বোনটাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল। জীপটা বেরিয়ে গেল না-থেমে। জীপের স্টীয়ারিং ছিল সাহেবজানের হাতে। তারপর থেকে ভাইবোনে ঘুরে বেড়ায়। ওদের এখন আর খিদে-তেষ্টা নেই।

সুব্রতর শরীর-মন যেন একশো ছ ডিগ্রি জ্বরের খপ্পরে। গল্পটা সত্যি হলে আরও অনেক কিছুকে যুক্তির শেকল পরানো যায় না। সুব্রত কিছু বুঝতে পারল না, চাইলও না। কিন্তু সেই অদ্ভুত জ্বরের ঘোরে ঘোলাটে মন একটা আগুনে রঙের মেঘে ঢাকা পড়তে লাগল। সেই মেঘটার সারা

এই বর্ষায়

রথীন্দ্র কর

সারাদিন অনাসৃষ্টি
ঝিরঝির-ঝির বৃষ্টি
টুপ-টাপ-টুপ ঝুপঝাপ
ঘরে বসে থাকি চুপচাপ
নদীপারা সব রাস্তা
কিচ্ছুটি নেই খাস্তা
খই-মুড়ি গেছে চুপসে
তেলেভাজা খাই খুব-সে।

গায়ে রাগী বিদ্যুতের ঝিলিক।

"সাহেবজানকে আজ আর জান নিয়ে ফিরতে দেব না," সেই রাগটা আচমকা প্রতিজ্ঞার চেহারা নিয়ে বেরিয়ে এল। সুব্রতর বাঁ হাতটা ছুঁয়ে গেল হোলস্টারে রিভলভারের বাঁটটা।

"ঠিকই কইছেন, সাহেবজানের আজ শ্যাষ দিন," কানের কাছে নিজের কথার প্রতিধ্বনি শুনল সুব্রত।

কিন্তু সামনে অন্ধকারের আর শেষ নেই। এবড়ো-খেবড়ো ধান-কাটা মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে মাঝে-মাঝে হোঁচট খাচ্ছিল সুব্রত। কিন্তু সেই বরফের হাতকড়াটার জোরে সামলে নিচ্ছিল পড়তে-পড়তে। আগে আগে সমানে চলেছে সেই ঘুঙুরের শব্দ। দূরে অন্ধকারের মধ্যে আর একটা অন্ধকার আড়াআড়ি পাঁচিল হয়ে দাঁড়িয়ে।

"সাবধান," কানের কাছে ফিসফিসিয়ে উঠল সেই ছেলেমানুষি গলাটা, "আইয়া পড়ছি, সামনে ক্যানেলের পাড়। নীচে জলের ধারে সাহেবজান বইস্যা লুটের মাল ভাগ করত্যাছে। আপনে আর কথা কইয়েন না।"

বরফের হাতকড়ার মালিক ওকে বুকে হাঁটিয়ে ক্যানেলের উঁচু পাড়ের মাথায় তুলল। ঘুঙুরের শব্দটা থামল এতক্ষণে।

"নীচের দিকে দ্যাখেন, ঠাহর পান কিছু," সুব্রতর কানের কাছে আবার ফিসফিস। হাতের কবজিতে সেই চাপটা আর নেই।

একটা দাপানো রাগ সুব্রতর দোমড়ানো-মচকানো শরীর আর মনকে কোনোরকমে ধরে রেখেছিল। সেই রাগের খোঁচাতেই প্রায় বুজে-আসা চোখদুটোকে সার্চলাইট বানিয়ে দেখার চেষ্টা করল। ক্যানালের জল যেখানে, অন্ধকার সেই লম্বা ফালি বরাবর একটা ঘোলাটে হালকা রঙকে জায়গা করে

একজনে অনেকগুলো গাছ

মুখের ওপর একরাশ কালো ধোঁয়া ছেড়ে বাসটা চলে গেল। পোড়া ডিজেলের গন্ধে পেটের ভাত উঠে আসার জোগাড়। কলকাতার রাস্তায় এ আর নতুন কি অভিজ্ঞতা?

এসব তো নিত্যকার ঘটনা তোমাদের জীবনেও। তবে পুরোনো হলেও দরকারী কথাটা তোমাদের আর একবার মনে করিয়ে দেওয়া যাক। কলকাতার বাতাস আজ ভয়ঙ্কর রকম নোংরা বা দূষিত হয়ে উঠেছে। বাস, মোটরের পোড়া মবিলের বিষাক্ত কালো ধোঁয়া, গেরস্থ বাড়ির উনুন, কলকারখানার ধোঁয়া ইত্যাদি কলকাতার বাতাসকে করে তুলেছে নিঃশ্বাস নেওয়ার অযোগ্য। আর যত দিন যাচ্ছে, ততই এই দূষিত হাওয়া কলকাতার মানুষকে করে তুলেছে অসুস্থ। নানারকম শ্বাসজনিত ও ফুসফুসের রোগ বাড়ছে।

তাই বলে হাওয়া বদলের জন্যে কলকাতাকে তো আর দেওঘর বা মধুপুরে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তার বদলে মধুপুরের সাফ সুত্‌রা হাওয়া বইয়ে দিতে হবে কলকাতার বুকে। কি করে? অনেক অনেক গাছ পুঁতে। গাছ যে কার্বন-ডায়োক্‌সাইড গ্রহণ ক'রে অক্‌সিজেন ত্যাগ করে এটাও তোমাদের জানা খবর। তবে এবারে কিন্তু "প্রত্যেকে একটা করে" নয়, "একজনে অনেকগুলো" করে গাছ লাগাতে হবে। আর সারা বছর ধরে। কলকাতার মাটিতে সেটা সম্ভব যদি একটু যত্ন নেওয়া যায়।

(জনসংযোগ বিভাগ, সি, এম, ডি, এ, ৩-এ অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত)

দিয়েছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুব্রত বুঝল তার কাছ থেকে ডান দিকে জলের কিনারা বরাবর পাঁচ-ছটা অন্ধকারের পুঁটলি অথবা মানুষ নড়াচড়া করছে। কিন্তু সাহেবজান কোন্‌টা সে বুঝবে কী করে।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব পেল। কানের কাছে আবার সেই ফিসফিসোনি। সব চেয়ে লম্বা-চওড়া লোকটা সাহেবজান। কিন্তু হরদেও গোয়ালা এর মধ্যে নেই। সে তার লোকজনদের নিয়ে অন্য দিকে ভেগেছে। লুটের মাল সবই সাহেবজানের দখলে। ওর সঙ্গের লোকগুলো সেদিনও ছিল জিপের মধ্যে, কাশীরাম আগরওয়ালার গদি লুট করে পালাবার সময়। কখন যেন সুব্রত শুনেছিল কথাগুলো। কিন্তু কিসের জিপ, কে কাশীরাম আগরওয়ালা —এ-সব প্রশ্ন ওর কাছে পাত্তা পেল না।

আবার কানের কাছে ফিসফিস। একটু দূরে রাখা থলিটায় বেশ কয়েকটা তাজা বোমা আছে। আশেপাশে ছড়ানো ছোট-বড় পাথরের টুকরো। ক্যানালের পাড় বাঁধবার জন্যে কোন্ সময় জড় করা হয়েছিল। এর একখানা নিয়ে ওই থলিটার ওপর ঝাড়তে পারলে কাজ ফতে। এতগুলো বোমা এক সঙ্গে অত কাছে ফাটলে আর একজনও আস্ত থাকবে না।

সুব্রত উপুড় হয়ে শুয়েই ডান হাতে একটা পাথর তোলার চেষ্টা করল। হাত কাঁপছে।

"আপনে পারবেন না, ছাইড়্যা দ্যান, আপনে আরও ডাইন দিকে সইর‍্যা যান, সাহেবজানের গুলি কইর‍্যা ফ্যালান্। ওর চক্ষু দুইটা বিড়ালের মতো কটা, ওর জানও কড়া বিড়ালের মতো। বোমার থলি হইতে সব চেয়ে দূরে আছে ও," সুব্রত তার নজরের আড়াল সেনাপতির কথাগুলো শুনল।

উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়েই রিভলভারটা হোলস্টার থেকে বার করল। বাবা আদমের আমলের কাঠের বাঁট-ওয়ালা পয়েন্ট থ্রি এইট বোরের ঢাউস ওয়েবলি অ্যাণ্ড স্কট। সেই ইংরেজ জমানা থেকে তাদের বানানো এই অস্ত্রটি পুলিশের হাতিয়ার হিসেবে চলে আসছে। চেহারাটা বেঢপ হলেও পাল্লার মধ্যে পেলে একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র। বাঁধের কিনারা বরাবর এসে ডান হাতে শক্ত মুঠোয় বাগিয়ে ধরল রিভলভারটা। লোকগুলো চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

সুব্রত আস্তে বুড়ো আঙুল দিয়ে সেফটি ক্যাচটা ঠেলে দিল। কিন্তু সেই সামান্য শব্দেই স্প্রিঙের মতো লাফিয়ে উঠল একটা লম্বা-চওড়া অন্ধকার।

"মারেন," কানের ওপর শব্দর চাবুকটা পড়ামাত্র সুব্রত ট্রিগার টিপল। একটা চিৎকারে অন্ধকার ফালা-ফালা হতে না হতেই সুব্রতর বাঁ হাতের নীচের পাথরটা হ্যাঁচকা একটা টানে আপনা-আপনি শূন্যে লাফিয়ে উঠল। কনকনে ঠাণ্ডা কী যেন একটা সুব্রতর ঘাড়ে প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে গড়িয়ে দিল বাঁধের বাইরের গা বরাবর। ক্যানালের দিক থেকে অমনি কান-ফাটা একটা প্রচণ্ড শব্দ আর আগুনের ঝলক। শুধু এক লহমার জন্যে। তারপর অন্ধকার তার সঙ্গী নিস্তব্ধতাকে নিয়ে ফিরে এল। বাতাসে বারুদের গন্ধ।

সুব্রত শুনল ঘুঙুরের শব্দ ক্যানালের পাড় বরাবর নেমে যাচ্ছে। তার সঙ্গে দুটো কচি হাতে হাততালির লহরা। রিভলভারটা হাতের মুঠোয় ধরে সুব্রত উপুড় হয়ে শুয়েই রইল। মাটিতে মুখ গুঁজে। (শেষ)

ছবি: অনুপ রায়

ডাবর আমলার 'কেশ যত্ন'
এনে দেয় দীর্ঘ, কালো, রেশমী চুলের বাহার

নারীকে রূপ-লাবণ্যে ভরিয়ে তোলে, তার এক ঢাল দীর্ঘ, কালো, রেশমী চুল। কিন্তু এর জন্যে চাই নিয়মিত কেশ পরিচর্য্যা—ডাবর আমলা কেশ তেল দিয়ে।
মাথাও ঠাণ্ডা রাখে, চুলের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনে, ডাবর আমলা কেশ তেল। বহুদিনের জনপ্রিয়, কেশ পরিচর্য্যার গোড়ার কথা।

সুমিষ্ট গন্ধে ভরা
ডাবর আমলা কেশ তেল।

ডাবর...প্রায় একশ' বছর ধরে আপনার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের সেবায়

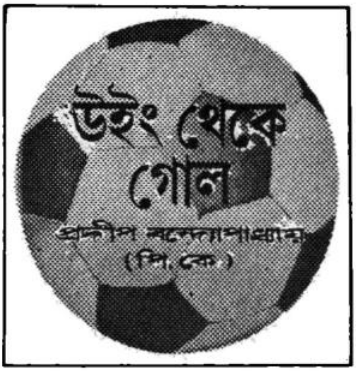

॥ ৫০ ॥

একয়ট্টির মারডেকা ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলতে যাওয়ার এবং ফেরার সময় এমন দুটি ঘটনা ঘটেছিল, যা একটু দেরিতে মনে পড়লেও, তোমাদের শোনানোর লোভ সামলাতে পারছি না।

কুয়ালালামপুর যাওয়ার জন্য ব্যাংকক থেকে সবে প্লেন ছেড়েছে। হঠাৎ অরুণ ঘোষ বললেন সুকুমার সমাজপতিকে, "ঐ দ্যাখ সমাজ, বাঁ দিকটায় কী জোর আলো!" সমাজ দেখে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, "আলো কোথায়, এ তো আগুন!"

আমি বাঁ দিকেরই একটা উইণ্ডো-সিটে বসেছিলাম। দেখলাম, প্রচুর ধোঁয়া বেরোচ্ছে, ইঞ্জিনের বাঁ দিকে কোথাও আগুন লেগে গেছে। অনুভব করলাম, আমরা মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে।

এবং তখনই ঘোষণা করা হল, প্লেন ব্যাংকক বিমানবন্দরে ফিরে যাচ্ছে। সেই কুড়ি-পঁচিশ মিনিট আমরা যে কী ভেবেছিলাম, টেপরেকর্ডারে ধরে রাখলে হয়তো ভাল হত! শেষ পর্যন্ত নিরাপদেই ব্যাংকক এয়ারপোর্টে ফিরে এলাম। দেখলাম নিরাপত্তার জন্য অনেক রকম ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। অবশ্য, ভাগ্য বিরূপ হলে এই সব ব্যবস্থা সত্ত্বেও বিপদ ঘটত।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছিল মারডেকা থেকে ফেরার পথে সিঙ্গাপুরে। তখন আমরা খুব বেশি টাকা নিয়ে বিদেশে যেতাম না। কেউ পাঁচশো, কেউ বড় জোর হাজার টাকা নিয়ে যেত।

সিঙ্গাপুরে ট্রেনে ওঠার সময় দেখি, কম্পার্টমেন্টের দরজার সামনে একটা মানিব্যাগ পড়ে রয়েছে। কার? তখনই চুনী এসে বললেন,"আমি দূর থেকে দেখেছি, ওটা সমাজপতির পকেট থেকে পড়ে গেছে। এখন রেখে দে, বেশ মজা করা যাবে।"

ট্রেন ছাড়তেই শুনলাম সমাজের আর্তনাদ, "আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে! আমার পার্স হারিয়ে গেছে! আমি মরে যাব, মরে যাব!"

চুনী চোখ টিপে ইশারা করলেন,"এখন চুপচাপ থেকে যা, মজাটা বাড়ুক।"

সমাজ বললেন, "পার্সে দু'হাজার টাকা ছিল। আমার টাকা নয়। কেউ ঘড়ি, কেউ টেপরেকর্ডার, কেউ বা অন্য কিছু কিনতে দিয়েছিল। কী করে এই টাকা শোধ করব!"

এবং তারপর, উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগলেন সুকুমার সমাজপতি। তখন চুনীকে বললাম, "আর মজা নয়, এবার দিয়ে দেওয়া উচিত।" সমাজের হাতে ব্যাগটা তুলে দিয়ে সব কথা জানালাম। সমাজ আমার হাত ধরে বললেন, "প্রদীপদা, আপনি বাঁচালেন। বিশ্বাস করুন, আমি ভাবছিলাম, চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ব কিনা!"

মারডেকা থেকে ফিরেই খড়গপুর যেতে হল, সর্বভারতীয় রেলদলের ট্রেনিং ক্যাম্পে। কোচ—স্বরাজ ঘোষ। কিন্তু প্রথম পাঁচ দিন কোচ ছিলেন অমল দত্ত।

তেলচিটে চামচ?

বাড়ীতে ভিম নেই বুঝি!

ভিম-এ তেলচিটেভাব দূর করার শক্তি, অন্য যেকোনো পরিষ্কার করার পাউডারের চেয়ে অনেক বেশী!

সাধারণ পরিষ্কার করার পাউডার, একে তো তেলচিটেভাব ঠিক মত দূর করে না, তার ওপর রান্নার বাসন আর কাঁচের বা স্টেনলেস স্টীলের বাসনপত্তরে পাউডারের ফোঁটা বা পোঁচের দাগ অবশিষ্ট রাখে।

ভিম-এ আছে তেলচিটেভাব দূর করার অধিক শক্তি। এটি আপনার খাওয়ার বাসনপত্তর পরিষ্কার ঝলমলে করে তোলে। আপনার বাসনে আনুন ভিম-এর চমক!

ভিম

ভিম আনে নিখুঁত ঝলমলে চমক!

LINTAS-V.86-1810 BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

তিনিও বিলেত-ফেরত। অমলদার সঙ্গে এরিয়ানে একসঙ্গে খেলেছি। কেন যে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা অবশ্য আমরা জানতাম না।

অল্প কয়েকদিন ট্রেনিংয়ের পর আমরা বোম্বাইয়ে সন্তোষ ট্রফির আসরে হাজির হলাম। দলে কিছু নতুন মুখ এল—মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জি, প্রশান্ত ব্যানার্জি, কল্যাণ টির্কি। সেন্ট্রাল রেলের নারায়ণ আর কাননও ছিলেন। ছিলেন জানকীরাম আর আপ্পালারাজুও।

বোম্বাইয়ে সেন্ট্রাল রেলের ওয়ার্কশপের পাশে যে মাঠে আমাদের প্র্যাকটিসের ব্যবস্থা হল, সেখানে কোনো ঘাস ছিল না। তবু, দারুণ ট্রেনিং হল।

এর আগে প্রাথমিক পর্যায়ের বাধা আমরা অনায়াসে ডিঙিয়ে এসেছিলাম। মূল আসরে আমাদের গ্রুপের প্রথম খেলায় আসামকে হারালাম পাঁচ গোলে। আমার তিন গোল। পরের দুটো ম্যাচেও জিতে আমরা সেমিফাইনালে উঠলাম।

সেমিফাইনালে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলা। বাংলার দুজন গোলকিপারের নাম সনৎ শেঠ এবং থঙ্গরাজ! প্রত্যেকটি পজিশনেই সর্বভারতীয় ফুটবলার। রহমান, জার্নেল সিং, অরুণ ঘোষ,কেম্পিয়া, রাম বাহাদুর, সমাজপতি, চুনী গোস্বামী, বলরাম, অরুময়নৈগম এবং নবাগত মঙ্গল পুরকায়স্থ। মঙ্গল সেবার ভয়ঙ্কর ফর্মে ছিলেন। ভেবে দ্যাখো, বাংলা দল কতখানি শক্তিশালী ছিল।

বাংলার প্রথম ম্যাচের দিন একটা ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনা না বলে দুর্ঘটনা বলাই ভাল। খেলার আগে ড্রেসিংরুমে বাংলা দলকে শুভেচ্ছা জানাতে আমরা অনেকেই গিয়েছিলাম। রেলদলের অধিকাংশ ফুটবলারই বাংলার ছেলে। যখন বাংলার ফুটবলাররা 'প্রেয়ার' শুরু করতে যাচ্ছেন, ঘরে বাইরের লোক বলতে ছিলাম আমি এবং রাইট উইঙ্গার দিপু দাস। সেবার রেলের ফুটবলার হলেও আমরা দুজনেই আগে বাংলার হয়ে খেলেছি। দু'বছর আগে আমি তো বাংলার ক্যাপ্টেনই ছিলাম। তাই নিজেদের বাইরের লোক মনে করিনি। কিন্তু বাংলার অধিনায়ক বেশ রুঢ়ভাবেই বললেন, "তোরা বাইরে যা, এখন আমরা একটু নিজেরাই থাকতে চাই।"

খুব লজ্জা পেলাম। তবু কাউকে কিছু বলতে চাইনি। কিন্তু দিপু দৌড়ে গিয়ে রেলের অন্য ফুটবলারদের বলে দিলেন, "জানিস, প্রদীপকে বেঙ্গল টিম প্রেয়ারের সময় ঘর থেকে বার করে দিয়েছে।"

যেন আগুন জ্বলে উঠল। ক্যাম্পে ফিরেই বুঝলাম, হাওয়া গরম। মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জির মতো তেজী আর একরোখা ছেলে আমি কখনও দেখেছি কিনা সন্দেহ।

সবাই বলল, "প্রদীপদা, ওদের এত স্পর্ধা, আপনাকে অপমান করল?"

আমি ওদের শান্ত করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় বললেন, "আপনি বাংলার ক্যাপ্টেন ছিলেন, বাংলার হয়ে সন্তোষ ট্রফি ফাইনালে উইনিং গোল করেছেন, সাত বছর ইণ্ডিয়া টিমে খেলেছেন, ঐভাবে মাথা নিচু করে বেরিয়ে আসা আপনার উচিত হয়নি।"

আগুনটা ধিকধিক করে জ্বলতেই থাকল। সেমিফাইনালে বাংলার সামনে এসে সেই আগুন যেন দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। ভাবতে পারো, সর্বভারতীয় তারকাসমৃদ্ধ ঐ বাংলা দলকে আমি হারিয়ে দিলাম? অনেক বাঘা ফুটবলারই সেদিন কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

স্পষ্ট মনে আছে, রাইট-ইনসাইড একটা বল বাড়িয়েছিল, যা আমার চেয়ে জার্নেল-অরুণের বেশি কাছে ছিল। প্রচণ্ড জোরে দৌড়ে গিয়ে অরুণকে এমন সাইড

পুশ করলাম যে, অরুণ কয়েক গজ ছিটকে পড়লেন। জার্নেলকেও গতিতে হারিয়ে গোলকিপারকে টেনে এনে আপ্পালাকে বল সাজিয়ে দিলাম। বিশ্বাস করো, আপ্পালা, জানকীরাম, দিপু দাস—পরপর তিনজন মিস কিক করলেন!

বাংলার যাবতীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়ালেন গোলকিপার প্রদ্যোত বর্মন, লেফট ব্যাক মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জি এবং স্টপার সুধীর ধর। খেলা দারুণ জমে গেল। কুপারেজের দর্শকেরা নিজেদের ভাগ্যবান ভাবছিলেন।

অরুণ আর জার্নেলকে কাটিয়ে আর-একটা বল দিলাম আপ্পালারাজুরই পায়ে। প্রায় পঁয়ত্রিশ গজ দূর থেকে আপ্পালা এমন দুর্দান্ত শট নিলেন, যা রোখার সাধ্য সনৎ শেঠের মতো গোলকিপারেরও ছিল না।

এরপর দুই দলই কিছু সুযোগ নষ্ট করল। আর গোল হল না। বিক্রমজিৎ দেবনাথকে কাটিয়ে শেষ মুহূর্তে একটা ভাল শট নিয়েছিলাম। আমার দুর্ভাগ্য, বল বারে লেগে ফিরে এল।

ফাইনালে আমাদের মুখোমুখি হল বোম্বাই, যারা নিজেদের মাঠে খেলার সুযোগ পাচ্ছে।

খেলা শুরুর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কয়েকজনকে কাটিয়ে ফাঁকায় এসেও গোল করতে পারলাম না। বল বারে লাগল। কয়েক মিনিট পর একইভাবে ঢুকে গতি বাড়িয়ে যখন গোলে শট নিতে যাচ্ছি, হঠাৎ মনে হল, আমার ডান পায়ের উরুতে কে যেন ছুরি মারল, পা আটকে গেল। তাকিয়ে দেখি, হ্যামস্ট্রিংয়ে লাল-নীল রঙ, উরুর পিছন দিক রক্তাক্ত। উপায় নেই, বসে যেতেই হল। আমার সঙ্গে পরামর্শ করেই কোচ স্বরাজ ঘোষ মাঠে নামালেন দিপু দাসকে। দিপু মোহনবাগানের নামী রাইট উইঙ্গার। এক সময়ে আমার জায়গা কে নেবে, এই প্রশ্নে দিপুর সঙ্গে সমাজপতির তীব্র লড়াই ছিল। যাই হোক, বোম্বাই কিন্তু এদিন আর দাঁড়াতেই পারল না। আমরা চার গোলে জিতলাম। গোল করলেন দিপু দাস, দিনু দাস, নারায়ণ আর কানন।

ট্রফি নিতে যাওয়ার মতো অবস্থা আমার ছিল না। তবু, সবাই মিলে আমাকে মাথায় তুলে ট্রফির কাছে নিয়ে গেল। সন্তোষ ট্রফি নিলাম তখনকার প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভি কে কৃষ্ণ-মেননের হাত থেকে। দ্বিতীয় বছরেই সন্তোষ ট্রফি জয় করল সর্বভারতীয় রেলদল। কৃষ্ণমেনন রেলদলের, বিশেষ করে আমার অনেক প্রশংসা করলেন।

কলকাতায় ফেরার পর ইস্টার্ন রেলওয়ে এবং সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের পক্ষ থেকে কে কে দাস এবং এস কে খান্না স্টেশনে আমাদের স্বাগত জানালেন। সবার গলাতেই মালা উঠল। তখন আমরা ভাল খেলে ঐ মালা আর মিষ্টিই পেতাম।

দু-তিন দিন পরেই কে কে দাস আমাকে ডেকে বললেন, "এই চিঠিতে তোমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান। এই চিঠির একটা কপি তোমার সার্ভিস রেকর্ডেও থাকবে।" তারপর আর একটি চিঠি এল রহিমসাহেবের কাছ থেকে। তিনি জানালেন, একটা দারুণ সুখবর তুমি কয়েকদিনের মধ্যেই পাবে।

সুখবর এল যথাসময়েই। সেই বছর থেকেই ভারতের সেরা ক্রীড়াবিদদের অর্জুন পুরস্কার দেওয়া শুরু হল। ফুটবলার হিসাবে সেই পুরস্কারের জন্য প্রথম নির্বাচিত হলাম আমি। এবং সেই আনন্দের দিনে আমার বাবার কথাই মনে পড়ল, যিনি আমাকে বড়—অনেক বড় দেখতে চেয়েছিলেন।

(ক্রমশ)

টারজান
এডগার রাইস বারোজ
অজগর মরেছে! কিন্তু চোরাবালিতে ডুবে যাচ্ছেন টারজান!
ব্রিংক, অন্যদের ডাকো! শিগগির
ব্রিংক বেইশ! তাহলে উপায়?
ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে ব্রিংক! টারজান ওদিকে বিপন্ন!
টারজান! এ কী!
টারজান মারা পড়বে!
এত দূর থেকে চটপট ওকে সাহায্য করা সম্ভব নয়!
কিন্তু কিছু তো করতেই হবে চ্যাঙ্গো!
মরা অজগরটাকেই ওদের দিকে ছুঁড়ে মারি!
সাপ আমাকে মারতে চেয়েছিল। তাকেই দড়ির মতো কাজে লাগিয়ে আমি বাঁচলাম!
কিন্তু পরমুহূর্তেই অন্য বিপদ...
গোলা ছুঁড়ছে! মেজর মটালা!
উদ্দেশ্যটা কী?

শব্দ-সন্ধান

	১	২	৩	৪		
৫		৬				৭
৮	৯				১০	
১১				১২		
১৩			১৪		১৫	
		১৬		১৭		
	১৮					

সংকেত : পাশাপাশি : (১) কোন্ পাহাড় পাহাড় নয় ? (৬) আবর্জনা। (৮) পানীয়বিশেষ। (১০) বিনীত। (১১) জ্বালানি। (১২) কবি নয়। (১৩) ঝাল কন্দ। (১৫) সোজায় উদ্ভিদ, উলটোলে ফল। (১৬) নক্ষত্র। (১৮) বন্ধুর।

উপর-নীচ : (২) খই। (৩) ভারতের একটি রাজ্য। (৪) চাষি ও মাঝি উভয়েই ব্যবহার করে। (৫) কোনো-এক দৈত্য কী অবস্থায় ছিল ? (৭) বাঙালির প্রিয় গানের বই। (৯) করাত। (১০) পরীক্ষা দিতে গিয়ে যে-কাজটি করা অনুচিত। (১৪) বিশেষ্যরূপে বোঝায় শেষ পরিণতি, বিশেষণ হলে কঠোর। (১৬) কেউ খেলে, কেউ ম্যাজিক দেখায়—কিসের সাহায্যে ? (১৭) ধরা পড়লে ডাকাত কী ?—মিলিয়ে পাবে শব্দটি।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

জা	গা	লো		ডা	কা	ত
ব		ক	দ	মা		ম্বু
র		গী		ডো		রা
	প্র	তি	পা	ল	ক	
বি			ক্ষি			কে
শ্রা		কী	ক	ন		শ
ম	রী	চি		গ	হ্ব	র

ধাঁধা

বলতে গেলে ছোড়দিদের শাড়ি কেনা নিয়েই ছোটকা সেদিন ধাঁধাটা বানিয়ে ফেলল।

টাকাও ছোটকারই দেওয়া। গৌরী আর ছোড়দির জন্য দুশো টাকা দিয়েছিল ছোটকা। শর্ত ছিল, এক রকমের দুটো শাড়ি কিনতে হবে।

সারা দুপুর ধরে কলকাতা চষে সন্ধেবেলা দুটো শাড়ি নিয়ে ফিরল ছোড়দিরা। হুবহু এক ডিজাইনের শাড়ি, শুধু রঙটাই যা আলাদা।

ছোটকা মজা করে বলল, "শর্তভঙ্গ। টাকা ফেরত চাই।"

ছোড়দি তখনও হাঁফাচ্ছে। তাড়াতাড়ি বলল, "অনেক খুঁজেছি ছোটকা, কিন্তু হুবহু এক রকমের দুটো শাড়ি পেলাম না। রঙ মেলে

তো ডিজাইন মেলে না, ডিজাইন পছন্দ হল যদি-বা, রঙ আর এক হল না।"

সেদিন রাত্তিরবেলা ধাঁধা নিতে গিয়ে দেখি, ছোটকা কখন যেন এই রঙ-মেলানোর ব্যাপার নিয়েই একটা ধাঁধা তৈরি করে ফেলেছে।

সেটাই এবার শুরুর ধাঁধা।

প্রথম ধাঁধা ॥ এক শাড়ির দোকানদারের তিন মেয়ে। তিনি ঠিক করলেন পুজোয় তিন মেয়েকে হুবহু এক রকমের তিনটে শাড়ি দেবেন। রঙও এক হবে, ডিজাইনও এক হবে।

ভদ্রলোক বোম্বের এক কোম্পানির বিজ্ঞাপন দেখে জানলেন—তারা পুজোয় নতুন ডিজাইনের একটি শাড়ি বার করেছে। সাত রঙে পাওয়া যাচ্ছে শাড়িটি। কোম্পানিটি খুবই নামী। ভদ্রলোক এর আগেও ওখান থেকে শাড়ি আনিয়েছেন বিক্রির জন্য। কলকাতায় শুধু তাঁর দোকানেই ওই কোম্পানির শাড়ি বিক্রি হয়। কিন্তু একটাই মুশকিল, বিশেষ রঙ সম্পর্কে কোনও পছন্দ জানিয়ে লাভ নেই ওই কোম্পানিতে। ওরা রঙ-অনুযায়ী অর্ডার নেয় না।

ভদ্রলোক তখন মাথা ঘামাতে বসলেন। কমপক্ষে কটা শাড়ির অর্ডার দিলে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন যে, এক রঙের ও এক ডিজাইনের তিনটে নতুন শাড়ি তিনি পাবেনই। ভদ্রলোক মাথা ঘামান, তোমরাও ঘামাও। দেখি, কে আগে বার করতে পারে অর্ডারের ন্যূনতম সংখ্যাটা।

দ্বিতীয় ধাঁধা॥ বন্ধনীর মধ্যে এমন শব্দ বসাতে পারো, যাতে বন্ধনীর বাঁ দিকের শব্দটা শেষ হয়, ডান দিকের শব্দটা শুরু হয়, ওই একই শব্দ দিয়ে—

অব (—) তম্য

তৃতীয় ধাঁধা ॥ প্রথম সংখ্যাটা ভাল করে লক্ষ করো, তারপর দ্বিতীয় সংখ্যাটার শূন্য স্থান পূর্ণ করো—

১২(৬৬)১০ ২০(?)১০

গতবারের উত্তর॥ (১) ২৬'৫৩ ছিল চেকে। তিনি পেয়েছিলেন ৫৩ টাকা ২৬ পয়সা। (২) অন্দরমহল। (৩) হম্বিতম্বি।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

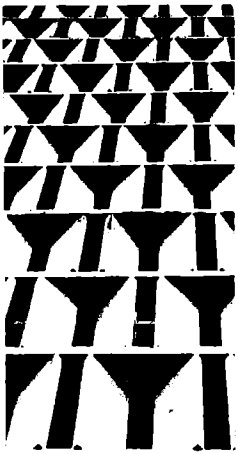

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল গণ্ডারের মুখের ফোটো

ফোটো : তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ কোন্ বই ভাল চলে ?
উঃ চলন্তিকা।
প্রঃ বই পড়তে বললেই যারা ভীষণ রেগে যায়, তাদের কী নামে ডাকা যায় বলুন তো ?
উঃ বৈরাগী।
প্রঃ কোন্ বর এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারে না ?
উঃ যাযাবর।
প্রঃ হাতপাখা দিয়ে পেটানোর কোনো শুদ্ধ বাংলা আছে ?
উঃ আছে। পক্ষাঘাত।

সুসেন

মজার খেলা

ছয় আর পাঁচে কত হয় বলো তো ? কত বললে ? এগারো ? হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।

কিন্তু এবারে যে-মজার খেলা খেলব, তাতে সমস্যাটা হল, ছয় আর পাঁচে নয় বানানো।

ভাবছ তো, সে আবার কী ?

বেশ, নীচের ছবির মতো করে ছ'টা দেশলাই - কাঠি টেবিলে সাজাও—

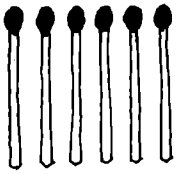

সাজিয়েছ ? বেশ, এবারে আরও পাঁচটা দেশলাই কাঠি নাও। এই পাঁচটা কাঠি কোনও বন্ধুর হাতে দাও। দিয়ে তাকে বলো— পাঁচটা কাঠিকে এমনভাবে টেবিলে সাজাতে হবে যে, ছটা আর পাঁচটা মিলে মোট নয় হবে।

বন্ধু ভাববে, নির্ঘাত তুমি ভুল বকছ। ছয় আর পাঁচে এগারো হতে পারে, নয় হবে কী করে ?

সে তো হেরে ভূত। সুতরাং তোমাকেই করে দেখাতে হবে। বেশ তো, করে দেখিয়ে দাও না !

কী হল ? হচ্ছে না ? তাহলে নীচের ছবিটা দেখে শিখে নাও কীভাবে কী হচ্ছে—

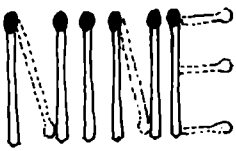

কী, নাইন হল না ? ফাইন হল। তাই না ?

মজারু

হাসিখুশি

মাস্টারমশাই বললেন, "আমাকে একটা সত্যি কথা বলো তো বুকুন, কে তোমার হোমটাস্ক করে দেন ?"

"বড়দা।"

"তিনি একাই ?"

"না, আমিও তাঁকে সাহায্য করি।"

মাস্টারমশাই কলম্বাসের গল্প শোনাচ্ছিলেন। গল্প শেষ করার আগে তিনি বললেন, "এ সবই চারশো বছর আগের ঘটনা।"

বুকুন বলল, "আপনার তো খুব মনে থাকে মাস্টারমশাই। আমি আজ যা পড়ি কাল তা ভুলে যাই। আর আপনি চারশো বছর আগের ঘটনা ঠিক মনে রেখেছেন।"

"প্রায় চল্লিশ বছর আগে আপনাদের লাইব্রেরি থেকে এই বইটি জ্যাঠামশাই পড়তে নিয়েছিলেন। ফেরত দিতে বড় দেরি হয়ে গেল। দুঃখিত।"

"দুঃখিত হওয়ার কী আছে ? বইটি বোধহয় তেমন সুবিধের নয়, তাই পড়ে শেষ করতে একটু বেশি সময় লেগেছে।"

গৃহকর্ত্রী ডোর-বেলের আওয়াজ শুনে কাজের মেয়েটিকে বললেন, "অবলা, দ্যাখ তো, বাইরে বোধহয় কোনো ভদ্রলোক এসেছেন।"

অবলা দরজা খুলে দিয়ে এসে বলল, "না মা, কোনো ভদ্রলোক নয়, আমাদের কর্তাবাবু।"

ছবি : অহিভূষণ মালিক

ক্যালকুলাসটা রামছাগল ! পাইপটা ওর হাতের ধাক্কায় কোথায় পড়ল!
?
কুটুসটাও দেখছি মহা ঝামেলা করছে !
ভৌ ! ভৌ !
থাম শিগগির ! থাম !
ভৌ ! ভৌ !
আরে, কুকুরটাকে জ্বালাচ্ছেন কেন ক্যাপ্টেন ?
আমি জ্বালাচ্ছি ?
ওই তো আমাকে জ্বালাচ্ছে !
ভৌ !
বাবা রে !
অবজারভেটরি কলিং ! কে 'বাবা রে' বলল ?
ও কিছু না...ক্যাপ্টেন তাঁর পাইপ খুঁজে পেয়েছেন !
অনেক ঘণ্টা বাদে...
অবজারভেটরি টু কনট্রোল...আর তিন মিনিটের মধ্যেই আমাদের রকেট চাঁদকে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করবে...
রকেটের নিজস্ব গতি আর চাঁদের অভিকর্ষ প্রদক্ষিণের পক্ষে এই যথেষ্ট। মোটর তখন বন্ধ থাকবে। আবার যখন এগ্ন-এফ-এল আর ৬ দেখা দেবে, রেডিয়ো-কনট্রোল তখন আবার চালু করলেই চলবে।
অ্যাটেনশন ! তিরিশ সেকেন্ড বাদে পরমাণু-মোটর বন্ধ করুন ! রেডি ! আর দশ সেকেন্ড... নয়...আট...সাত...ছয়...পাঁচ...চার...
তিন...দুই...এক...জিরো !
অবজারভেটরি টু কনট্রোল ! এগ্ন-এফ-এল আর ৬ চাঁদকে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করেছে...
আধ মিনিটের মধ্যেই রকেট আমাদের চোখের আড়ালে চলে যাবে
আর দেখা যাচ্ছে না !
ইতিমধ্যে...
ওদের রকেট চাঁদের আড়ালে চলে গেছে ! ...এইবার শুরু হবে আমাদের কাজ !
একবার ভাবুন ! ইতিহাসে এই প্রথম চাঁদের ও-পিঠের ফোটো তোলা হবে ! আর এটা সম্ভব হয়েছে আমাদেরই তৈরি রকেটের দৌলতে !
অবজারভেটরি টু কনট্রোল...আর তিন মিনিটের মধ্যেই রকেট আবার দেখা দেবে...
দেখা দিয়েছে !
হ্যাঁ, ওই তো !
অবজারভেটরি টু কনট্রোল রুম... তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে পরমাণু-মোটর আবার চালু করুন...
আমি চালু করতে পারব ?
নিশ্চয়ই !
অবজারভেটার টু কনট্রোল... দশ সেকেন্ড... নয়...আট... সাত...ছয়...পাঁচ...চার...তিন... দুই...এক...জিরো !
টানি ?
টানো !
একটা হাতল টানতেই হাজার-হাজার মাইল দূরে একটা মোটর চালু হয়ে গেল ! বিজ্ঞানের কী মহিমা !
অবজারভেটরি টু কনট্রোল... কারেকশন করুন... জিরো জিরো নাইন এইট...
জিরো জিরো নাইন এইট করেছি
কারেকশন করুন... থ্রি টু সেভেন সিক্স...
থ্রি টু সেভেন সিক্স। করেছি

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

নিউট্রামূল 'দাদা' হবার জন্যে
দারাসিং-এর শক্তিবৃদ্ধি শিক্ষাপ্রণালী
১
লম্বা হওয়ার জন্যে ব্যায়াম।
২
পা দুটো ১০ ইঞ্চি ফাঁকতে রেখে দাঁড়াও। শ্বাস টানো। ডিং মেরে দাঁড়াও, হাত দুটো যত উঁচু করে সম্ভব আঙুলে আঙুল ছোঁয়াও। শুরুর ভঙ্গীতে ফেরো, শ্বাস ফেলো। ১০ বার।
৩
পা দুটো ছড়িয়ে, সোজা রেখে মাটিতে বসো। শ্বাস টানো, সামনে ঝোঁকো। দু হাতে বাঁ পায়ের আঙুল ছোঁও, হাঁটুতে মাথা ছোঁয়াও। শুরুর ভঙ্গীতে ফেরো, শ্বাস ফেলো। ১০ বার বাঁ, ১০ বার ডান পায়ে।
গায়ের জোর বাড়াও, রোজ নিউট্রামূল খাও।
নিউট্রামূলের ভোজ খাওঃ
নিউট্রামূল তৈরী করে—স্বাদেভরা
মিল্ক-শেক, আইস-ক্রীম, পুডিং!
কেকে মাখাও, বিস্কুটে লাগাও,
মাখন মাখানো টোস্টে ছড়াও···
যাতে খুশি তাতে খাও,
দারুণ মজাদার!
তবে মায়েরা মনে রাখবেন: এত সব সত্বেও
নিউট্রামূলের দাম— বোর্ণভিটা, বুস্ট আর
মাল্টোভার মত পানীয়র তুলনায়
অনেক কম! শক্তি অর্জনের পথে···
নিউট্রামূলকে নাও সাথে! সুস্থ
থাকতে, সব কাজে উৎসাহ
পেতে, আনন্দে ভরে থাকতে!
সুসম্পন্ন কাজ···নিউট্রামূল
দাদার পরিচয় আজ!
daCunha/GCM/69/82/BG
Nutramul
আমূলের
নিউট্রামূল
বিক্রেতা:
গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং
ফেডারেশন লিমিটেড
আনন্দ, গুজরাট

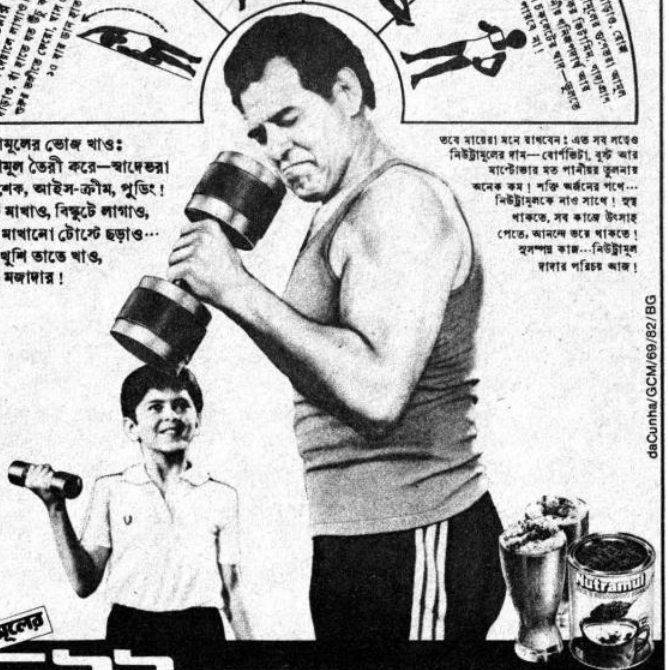

রুআহা

বুদ্ধদেব গুহ

আগে যা ঘটেছে : ঋজুদা রুদ্র আর তিতিরকে নিয়ে আফ্রিকায় এসেছে। উঠেছে ডার-এস-সালামের এক হোটেলে। এরপর তিনজনে ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে আরুশা শহরে যাবে। উদ্দেশ্য ভূষণ্ডার সঙ্গে মোকাবিলা। সে-লোকটা আফ্রিকার পশুসম্পদ-চোরাকারবারি এক চক্রের সঙ্গে যুক্ত। মিঃ শাহ নামে এক আফ্রিকা-প্রবাসী গুজরাটি ব্যবসায়ী ওদের ডিনারের নেমন্তন্ন করেন। তাঁর বাংলোর পিছনে রহস্যময় বাগান, সেখানে রহস্যময় আলো এবং রহস্যময় এক দীর্ঘকায় নিগ্রো। সে রুদ্র ও তিতিরকে ওয়ানাকিরি ওয়ানাবেরির গল্প বলে। তার নিজের নামও ওয়ানাবেরি। তার বলা গল্পের মধ্যেই বা কিসের ইঙ্গিত ? হোটেলে ওরা তিতিরের ঘরের টেবিলে তীর দিয়ে গাঁথা একটা ছোট্ট চিঠি পেল। তাতে লেখা—ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে যাও, নইলে— ! চিঠি পড়ে তিতির অবশ্য একটুও ঘাবড়াল না। বালিশের নীচে পিস্তল, নিশ্চিন্তেই ঘুমিয়ে পড়ল সে। তারপর···

॥ ৫ ॥

সকাল আটটার মধ্যে তৈরি হয়ে ঋজুদার ঘরে এলাম আমি আর তিতির। ছদ্মবেশের জিনিসপত্র ঠিকঠাক করে রেখেছি। বাথরুমের আয়নাতে দাঁতটা লাগিয়ে দেখেও নিয়েছি একবার। দারুণ দেখাচ্ছিল। প্রায় দানুয়া-ভুলুয়ার জঙ্গলের দাঁতাল শুয়োরের মতো। মা তাঁর সাধের ছেলেকে তখন দেখলে নির্ঘাত অজ্ঞান হয়ে যেত।

রুম-সার্ভিসকে বলে ঘরেই ঋজুদার জন্যে কফি আর আমাদের জন্যে দুধ আনিয়ে নেওয়া হল। কফির পেয়ালায় সুগার-কিউব ফেলে চামচ নেড়ে মেশাতে মেশাতে হাসতে হাসতে ঋজুদা বলল, "ব্রেকফাসট আর খায় না ! যা ঝামেলা বাধালি তোরা আফ্রিকার মাটিতে পা দিতে না-দিতেই। কী দরকার ছিল ওয়ানাবেরির সঙ্গে টক্কর মারতে যাওয়ার ?"

বললাম, "আমরা কি টক্কর মারতে গেছি নাকি ? সে-ই তো টরে-টক্কা করে টক্কর বাধাল।"

আমাদের কাছ থেকে কালকের অভিজ্ঞতা এবং মিঃ শাহর বসবার ঘরের দেওয়ালের ফোটোর কথাও ঋজুদা শুনেছিল। ফোটোর কথা শুনেই ঋজুদা হেসেছিল। মাঝে-মাঝে বেশি-বেশি বিজ্ঞের মতো ভাব দেখায় ঋজুদা। ভূষণ্ডার গুলি খাওয়ার পর থেকে একটু বোকা-বোকাও হয়ে গেছে যেন। নয়তো আমি আগের থেকে চালাক হয়েছি।

কফিটা খেয়েই ঋজুদা এয়ার তানজানিয়ার অফিসে ফোন করতে বলল আমাকে। করলাম। আরুশার তিনটে টিকিট পাওয়া যাবে কিনা জিজ্ঞেস করতে তাঁরা বললেন পাওয়া যাবে। কিন্তু কালকের ফ্লাইটের কোনো টিকিট নেই। পরশুর আছে।

ঋজুদা বলল, "বলে দে, আমরা এক ঘণ্টার মধ্যে টিকিট নিয়ে নেব।"

তাই-ই বলে দিলাম।

"পনেরো মিনিট সময় দিলাম। যার যার ভেক ধরো নিজেরা।" তারপরই বলল, "নাঃ ! সঙ্গেই নিয়ে চল ব্যাগে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। ঘরের চাবি সঙ্গে নিয়ে বেরুবি—রিসেপশানে জমা দেওয়ার দরকার নেই।"

নীচে নেমে, হোটেলের লবি থেকে

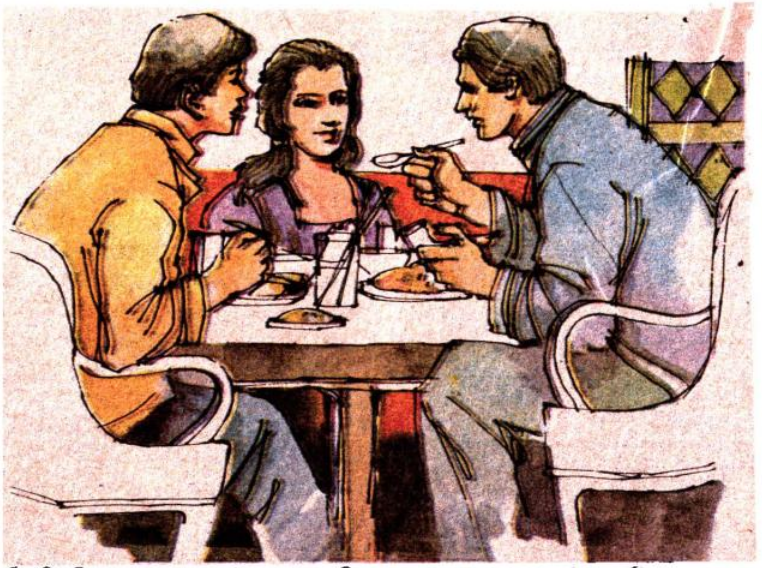

চিরুনি কিনল ঋজুদা একটা। দাম কুড়ি টাকা মাত্র। আমি ভেবেছিলাম হাতির দাঁতের হবে বুঝি। হাত দিয়ে দেখি কেলে প্লাস্টিক। ঋজুদা বলল, "এমনিতে কি আর এশিয়ানদের উপর এত রাগ আফ্রিকানদের ? ভারত থেকে দু টাকার চিরুনি এনে এখানে কুড়ি টাকায় বিক্রি করলে ওরা যদি এশিয়ানদের অদূর-ভবিষ্যতে কিলিয়ে কাঁটাল পাকায় তাতে আর দোষ কী ? বল ?"

ট্যাক্সি নিয়ে ডাউনটাউনে এসে বেশ বড় একটা জমজমাট রেস্তোরাঁর সামনে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে আমরা ভিতরে ঢুকলাম। এয়ার-কণ্ডিশান্ড স্বপ্নালোকিত রেস্তোরাঁ। কিন্তু ভিড় গিশগিশ। তারই মধ্যে একটি অন্ধকার কোনায় আমরা গিয়ে বসলাম। কফি, তার সঙ্গে সসেজ উইথ বেকন অর্ডার করল ঋজুদা নিজের জন্যে। তিতির চিকেন ওমলেট আর ড্রিঙ্কিং চকোলেট। আমি মাটন হ্যামবার্গার আর চা। সাতসকালে বড় এক গ্লাস দুধ খেয়ে গা গোল্যাচ্ছিল। দুধ আবার বড়রা খায় নাকি ? সমস্ত প্রাণিজগতে দুধ খায় শুধু দুগ্ধপোষ্যরাই। যেহেতু দুধের-শিশু তিতির সকালে দুধ খায় সুতরাং আমাকেও দুধ গেলাল ঋজুদা। এ-যাত্রা যদি বেঁচে ফিরি কলকাতায় তাহলে ভটকাই নিশ্চয়ই আওয়াজ দেবে আমাকে। তিতিরের বদলে ভটকাইটা এলে কত মজা হত ! কিন্তু কে বোঝে এসব কথা !

কাতলা মাছের হাঁ-করা মুখের মতো একটা হোঁতকা পাইপে জম্পেস করে তামাক ঠেসে, কালো লেদার-ফোমের চেয়ারে গা এলিয়ে বসল ঋজুদা। তার পর ধোঁয়া ছাড়তে লাগল চাঁদপাল ঘাটের লঞ্চঝড়ে মোটর-লঞ্চের মতো। বুঝলাম এখন বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়া চলবে। কতক্ষণ চলবে, তা ঋজুদাই জানে।

খাবার এসে গেলেই সোজা হয়ে বসে বলল, "রুদ্র, তুই যেমন পোশাকে আছিস এই পোশাকেই চলে যাবি এয়ার তানজানিয়ার অফিসে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে নিস। জাঞ্জিবারের টিকিট কাটবি তিনটে।

পরশুদিনের।"

"জাঞ্জিবার? সে তো অন্য দেশ।" আমি বললাম।

তিতির বলল, "তা কেন হবে? জাঞ্জিবার তো তানজানিয়ারই অংশ। মরিশাস দ্বীপপুঞ্জ আলাদা দেশ। দু জায়গাতেই মসলা হয় বলেই কি মসলা মেশাবে নাকি?

বড় ট্যাক-ট্যাক করে মেয়েটা। ভারী তো একটা সাবজেক্ট ভূগোল। পড়াশুনায় ভাল বলে যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করছে সবসময়। ভুষুণ্ডা আর ওয়ানাবেরির পাল্লায় পড়লে ভূগোল-জ্ঞান বেরিয়ে যাবে। ট্যাকট্যাকানি বন্ধ হবে তখন।

ঋজুদা বলল, "তিতির, তুমি খেয়ে নিয়েই রেস্তোরাঁর লেডিজ-রুমে গিয়ে মেক-আপ নিয়ে ট্যাক্সি করে চলে যাবে এয়ার তানজানিয়ার অফিসে। পরশুর টিকিট কাটবে তুমিও। তিনটে। তবে জাঞ্জিবারের নয়, আরুশার। একটাই ফ্লাইট আছে, সকালের দিকে। বোধহয় দশটা কি এগারোটা নাগাদ। রিপোর্টিং টাইমটাও জেনে আসবে।" বলেই বলল, "কী কী নামে কাটবে?"

ততক্ষণে খাবার এসে গেছিল। বেয়ারাকে অগ্রিম মোটা টিপ্‌স দিয়ে দিল ঋজুদা। সে বুঝল আমরা অনেকক্ষণ জ্বালাব এখানে। সে চলে যেতেই তিতির বলল, "সর্দার গুরিন্দর সিং, জন অ্যালেন এবং ক্রিস ভ্যালেরি!"

"রাইট!" ঋজুদা বলল, একটা গাব্দা-গোব্দা সসেজকে কাঁটা দিয়ে ধরে, ছুরি দিয়ে কেটে, মাস্টার্ড মাখাতে মাখাতে। তারপর সসেজের টুকরোটি মুখে পুরে দিয়েই বলল, "দুজনেই, টিকিট কেটেই আলাদা-আলাদা ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে আসবি। রেস্তোরাঁ থেকে বেশ খানিকটা দূরেই ছেড়ে দিবি ট্যাক্সি। তিতির ট্যাক্সি থেকে নেমে নিউজ-স্ট্যাণ্ড থেকে খবরের কাগজ কিনে রেস্তোরাঁতে ঢোকার সময় খবরের কাগজটা মুখের কাছে যথাসম্ভব তুলে ধরে, মুখ আড়াল করে লেডিজ-রুমে গিয়েই মেক-আপ ছেড়ে টেবিলে ফিরে আসবে। ওক্কে?"

আমরা দুজনেই একসঙ্গে বললাম, "ওক্কে।"

ট্র্যাভেলার্স চেকের বইটা পকেটে আছে কি নেই ভাল করে দেখে নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম। তিতির জানে না, কিন্তু আমি জানি যে, এখন একা-একা ভাবনায় বুঁদ হয়ে থাকবে ঋজুদা। একেবারে অন্য জগতে পৌঁছে যাবে। এই ঋজুদাকে আমারই ভয় করে, আর তিতির তো নতুন চিড়িয়া। বেচারি তিতির! কেন যে এখানে এল! কাল রাতের তীর-গাঁথা চিঠিটির কথা মনে পড়ে গেল আমার: 'গো হোম, উ্যা প্রেটি গার্ল, অর বী বেরিড্ ইন দি উইল্ডারনেস অব আফ্রিকা'।

মিনিট-কুড়ির মধ্যে ফিরে এলাম টিকিট নিয়ে। আমি ফেরার মিনিট-পনেরোর মধ্যেই তিতিরও ফিরল, লেডিজ-রুম হয়ে। ঠিক সেই সময়ই একটি ঘটনা ঘটল। কে যেন হঠাৎই ছবি তুললেন আমাদের। ফ্ল্যাশলাইটে।

ঋজুদার চোয়াল মুহূর্তের জন্যে শক্ত হয়ে এল। কিন্তু পরমুহূর্তেই একটি দারুণ নিঃশব্দ হাসি ছড়িয়ে গেল ঋজুদার মুখে। পোলারয়েড ক্যামেরা। ছবি তোলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রিণ্টটি বেরিয়ে এসেছিল ক্যামেরা থেকে। বেঁটেখাটো মিশকালো ফোটোগ্রাফার পাখার বাতাস করার মতো দু-তিনবার সেটাকে নাড়তে-চাড়তেই ছবিটা ফুটে উঠল। ফোটোগ্রাফার ছবিটি আমাদের টেবিলে রেখেই আর-একটি ছবি তুললেন।

ঋজুদা এবার শব্দ করে হাসল। বলল, "আশান্টে!"

বলেই তানজানিয়ান শিলিং-এর একটি বড় নোট বের করল তাঁর জন্যে মোটা পার্স থেকে।

ফোটোগ্রাফার টাকা নিলেন না।

সুপার রিন-এর শুভ্রতার অধিক চমক

অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট টয়লেট বা বারের চেয়ে অনেক বেশী!

সুপার রিন-এর নিয়মিত ব্যবহার আপনার জামাকাপড়ের চেহারাকে পাল্টে এমনই চমকদার করে তুলবে যা দূর থেকেও নজরে পড়বে!

সুপার রিন- অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট পাউডার বা বারে কাচা কাপড়ের চেয়ে অনেক বেশী ঝকঝকে সাদা ক'রে ধোয়। কারণ, সুপার রিন-এর শুভ্রতা আনার শক্তি যে অনেক বেশী!

চাক্ষুষ প্রমাণ করে নিন:

অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট বারে ধোয়া

সুপার রিন-এ ধোয়া

সুপার রিন-এ আছে শুভ্রতা আনার অনেক বেশী শক্তি!

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-RIN.40-1810 BG

বললেন, "আমি পয়সা নিই না। বিদেশী ট্যুরিস্টদের ছবি তুলি এমনিই। এক কপি তাঁদের দিয়ে দিই আর অন্য কপি ট্যুরিজম্ ডিপার্টমেন্টে ও পিকচার পোস্টকার্ড কোম্পানিদের কাছে বিক্রি করি।"

"তবু," ঋজুদা বলল, "আমার নববিবাহিতা স্ত্রী এবং একমাত্র শ্যালকের ছবি তুলে দিলেন। বখশিশ আপনাকে নিতেই হবে।"

ঋজুদার কথা শুনে তিতিরের মুখ এবং আমার দুই কান লাল হয়ে উঠল।

ভদ্রলোক টাকা যখন কিছুতেই নিলেন না, তখন ওঁর কপিটা চেয়ে নিল দেখবার জন্যে। নিয়েই ফোটোটির পিছনে বল পয়েন্ট পেন দিয়ে বড় বড় করে লিখল "টু ভুষুণ্ডা উইথ লাভ। ফ্রম ঋজু, রুদ্র অ্যাণ্ড তিতির"।

লেখাটি পড়তে পড়তে ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোকের গ্রামাফোনের রেকর্ডের মতো কালো মুখটি কালোতর হয়ে গেল। অবাক হয়ে, আমতা-আমতা করে তিনি বললেন, "ভুষুণ্ডা ? সে কে ? আমি তো চিনি না—"

ঋজুদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "চেনেন না ? আপনি তাকে না চিনলেও সে হয়তো আপনাকে চেনে। অথবা চিনে নেবে। যাই হোক, তার সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়, বাই-চান্স, তবে বলবেন যে, শুধুমাত্র তার সঙ্গে দেখা করতেই আমাদের এতদূর আসা!"

ফোটোগ্রাফারের ভ্যাবাচ্যাকা-খাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে হাসি পেল আমার।

উনি আমাদের সামনে ভক্তিভরে মাথা ঝুঁকিয়ে, বাও করে, চলে গেলেন।

★

আমাদের ফ্লাইটটা ঘণ্টাখানেক ডিলেড ছিল। বোয়িং। ভিতরে অ্যাকাসিয়া গাছ আর লম্বা-গলা জিরাফের ছবি আঁকা। প্লেনটা ট্যাক্সিইং করে টেক-অফ্ করার পরই সীট-বেল্ট খুলে ফেলে গা এলিয়ে দিলাম। পরশু, সেই রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে হোটেলে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে দুপুরে জোর ঘুম লাগিয়েছিলাম। বিকেলে ঋজুদা একাই বেরিয়েছিল কোথায় যেন। রাতে আমরা ঘরের চাবি পকেটে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম ট্যাক্সি করে। পথে তিনবার ট্যাক্সি বদল করে এবং সমুদ্রের পারের বড় বড় পাম গাছের ছায়ার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মেক-আপ নিয়ে সমুদ্রপারেরই ছোট্ট একটি হোটেলের কটেজে রাত এবং কালকের সমস্তটি দিন শুয়ে বসে গল্প করে কাটিয়ে ছদ্মবেশেই আজ সকালে এয়ারপোর্টে পৌঁছে এই ফ্লাইট ধরেছি। আমাদের বেশির ভাগ মালপত্রই রেখে এসেছি মাউন্ট কিলিম্যানজারো হোটেলে। জাঞ্জিবারের টিকিটগুলো এবং আসল পাসপোর্টও। নেহাত যা না-আনলেই নয়, তা ছাড়া কিছুই সঙ্গে আনতে পারিনি। তিতিরের ক্যামেরা, বাইনাকুলার সব-কিছুই রয়ে গেল। ঋজুদা অবশ্য বলেছে, সবই পাওয়া যাবে পরে, খোয়া যাবে না কিছুই। তবে কাজের জায়গায় কাজে লাগবে না, এই-ই যা।

আমরা তিনজন পোর্ট-সাইডে পাশাপাশি তিনটি সীটে বসেছি। ইংরিজিতেই কথা বলছি। তাই, খোল্‌সা করে কিছুই বলা যাচ্ছে না। এয়ার-হোস্টেস খবরের কাগজ দিয়ে গেল। কাগজ হাতে নিয়েই চোখ একেবারে ছানাবড়া! ঋজু বোস তাঁর নববিবাহিতা স্ত্রী এবং একমাত্র শ্যালকের সঙ্গে বসে আছেন। সেই ছবি কাগজের প্রথম পাতায়।

আমার মনে হল এর পরে মরে গেলেও আর আমার দুঃখ নেই। খবরের কাগজে ছবিই যখন ছাপা হয়ে গেল। আর কী ?

ছবির নীচে বড় বড় হরফে খবর। "হোটেল গেস্টস্ মিসিং। ডিস্‌অ্যাপীয়ারেন্স অব থ্রী ইণ্ডিয়ানস ফ্রম হোটেল কিলিম্যানজারো, শ্রাউডেড ইন মিস্ট্রি!"

নীচে সবিস্তারে ধানাই-পানাই।

আমি, সরি, জন অ্যালেন, ভুরু কুঁচকে বলল, "হোয়াট ড্যু উ্য থিংক ?"

কেন

সঞ্চয়নী

সমস্ত নন্ ব্যাঙ্কিং সঞ্চয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবার উপরে ?

কেন সর্বশ্রেষ্ঠ ?

কেননা "সঞ্চয়নী"ই একমাত্র সংস্থা, যাঁরা জনসাধারণের স্বার্থে জন্মমুহূর্ত থেকেই 'NO LAPSATION' এর সুবিধা দিয়েছেন।

সঞ্চয়নী কি করেছে ?

সঞ্চয়নী নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ করেছে কেননা আমাদের গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছে যার নাম "ফুসেপ"। এই যন্ত্রটির কাজ হলো বায়ুদূষণ রোধ করা এবং জ্বালানী খরচ কম করা। এই যন্ত্রটি যে কোন গাড়ী বা জেনারেটরে লাগালে প্রায় ২০% থেকে ৫০% জ্বালানী সাশ্রয় হয় এবং এটি বায়ুদূষণও রোধ করে এবং ইঞ্জিনের জীবনীশক্তিও বাড়ায়। উপরন্তু যে কোন গাড়ী স্বাভাবিক অবস্থার থেকে অন্ততঃ ৬০ হাজার কিঃ মিঃ অধিক যাত্রা করতে পারে।

সঞ্চয়নীর কাজ কি ?

সঞ্চয়নী আজকের ভয়াবহ বেকার সমস্যা সমাধানে ব্রতী এবং ইতিমধ্যেই সারা ভারতবর্ষে সঞ্চয়নী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সুবিধা ক'রে দিয়েছে। এছাড়া সঞ্চয়নীর গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে রূপায়নে সাহায্য ক'রে জাতির মেরুদণ্ড শক্ত করছে।

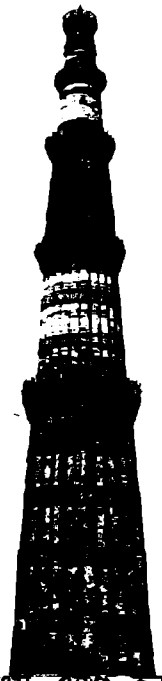

সঞ্চয়নীর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কি ?

গ্রামীণ উন্নয়নে সঞ্চয়নী বহুমুখী পরিকল্পনা নিয়েছে যেমন ট্রেড্‌ল পাম্প, আধুনিক রিক্সা, সৌরচুল্লী, স্বল্প ব্যয়ে গৃহনির্মাণ এবং খুব শীঘ্র 'কীটানুনাশক ঔষধ' ও জনহিতার্থে উপস্থিত করছে যেটা আশেপাশের বায়ু দূষিত করবে না। এখানে আবার আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ।

সঞ্চয়নী —

মাত্র সাড়ে তিন বছরেই সবার উপরে।

সঞ্চয়নী সেভিংস এ্যাণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট (ইঃ) লিঃ

"সঞ্চয়নী ভবন"

১৫৭/২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬

REG. NO: 31695

রেজিঃ অফিস : ৮২/২এ, বিধান সরণী কলিকাতা—৭০০ ০০৪ ফোন : ৫৫-৫০১৭

Nine 8231

ক্রিস ভ্যালেরি আমার দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, "ভেরি স্ট্রেঞ্জ ইনডিড। আই ওন্ট বী সারপ্রাইজড ইফ দে আর কাউণ্ড ডেড।"

পাশের সীটে বসা একজন জার্মানিয়ান পুলিশ-অফিসার তিতিরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে, কায়দা করে বাবার মতো বললাম, "মাই! মাই! ওয়েল, ইট্ ক্যান্ট বী!"

ঋজুদা খবরের কাগজের এক কোনায় কলপেন বের করে খসস্ খসস করে কী যেন লিখে আমাদের দিকে কাগজটা এগিয়ে দিল। দেখি, বিশুদ্ধ বাংলায় লেখা— অত পুটুর-পুটুর কথা কিসের? চুপচাপ ঘুমো।

ঋজুদার লিখন দেখে মিস ভ্যালেরির পিংক-প্রেস্টিজ একেবারে পাংচারড হয়ে গেল। আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "ভারী অসভ্য ঋজুকাকা!"

তিতিরের কানের মধ্যে আমিও প্রায় ঠোঁট ঢুকিয়ে বললাম, "উই! উই! মাদমোয়াজেল!"

ফ্রেঞ্চের 'উই' মানে যে ইংরিজি 'ইয়েস', মাত্র এইটুকু ফ্রেঞ্চ কৃপণ তিতির এ কদিনে শিখিয়েছিল আমাকে। এক শব্দ দিয়েই গুরুবধ করে দিলাম। একেই বলে, গুরু গুড়, চেলা চিনি!

ঘুম লাগাবার আগে তাকিয়ে দেখলাম ঘুমন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সর্দার গুরিন্দার সিং-এর সাদা গোঁফ সাহেব-তেলাপোকার শুঁড়ের মতো ফুরফুর করে উঠছে প্রতিবার নিশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে। আর ক্রিস ভ্যালেরি যে এতটা সুন্দরী তাও এর আগে কখনও খেয়াল করে দেখিনি। এদের দুজনের মধ্যে বিচ্ছিরি, ফল্স-দাঁতের তেতো—জন অ্যালেন একেবারেই বেমানান। হংস মধ্যে বক যথা!

(ক্রমশ)

ছবি: অনুপ রায়

ছবির মজা

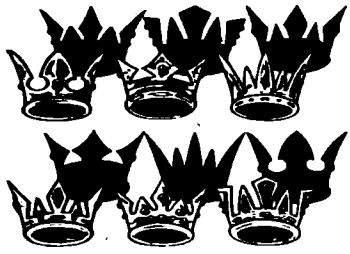

মুকুটগুলি ঠিকই আছে, কিন্তু ছায়া গেছে উল্টেপাল্টে। কোন্ মুকুটের কোন্ ছায়া, তোমার ছোট্ট ভাই কিংবা বোনকে সেটা খুঁজে নিতে বলো।

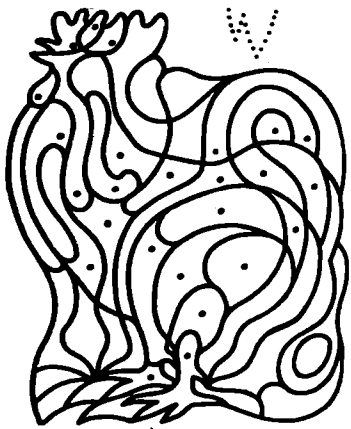

ফুটকি-দেওয়া খোপগুলোকে পেনসিল বুলিয়ে ভরাট করে দ্যাখো ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়।

রঞ্জিত কাল খেলার ভোল পালটে দিল,আর বাড়ী ফিরলো সেকি চেহারা!

"আমার লাকি শার্টটা
—আবার কত সাদা!"

হাই পাওয়ার সার্ফ
ধোয় সবচেয়ে সাদা করে
-এমন, যা নজরে পড়ে!
সাদা বা রঙীন-সবের জন্যেই ভালো!

LINTAS-SU-253-1812 BG

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

শিশিরকুমার বসু

(৫৮)

লালকেল্লার মাটির তলার সেলে ঢুকেই চোখে পড়ল দেওয়ালে কয়লা দিয়ে লেখা চারটি লাইন :

Stone Walls do not a prison make
Nor iron bars a cage.
The mind is its own place
And can make a heaven of hell.

পূর্ববর্তী কোনো বন্দীর ঐ লেখা পড়ে মনটা বেশ ভরে গেল। ঘরটি মাপে খুব ছোট ছিল না। তিন দিক দিয়েই বন্ধ, কেবল সামনের দিকে গরাদ দেওয়া দুটি জানালা ও একটি শক্ত লোহার গেট। খুবই অপরিচ্ছন্ন, দেওয়ালগুলি ঝুলে ভর্তি, মেঝেতে পুরু ধুলো। আসবাবের মধ্যে একটি লগবগে খাটিয়া। দালানের অন্যদিকে আর একটি সেল আছে তা আসবার সময় নজর করেছিলাম।

সেলের ভারপ্রাপ্ত লোকটি আমার সঙ্গে দেখা করে গেল। নাম মহম্মদ নাজির, দেখে পুলিশের লোক বলে মনেই হয় না, পরনে লুঙ্গি আর হাফ শার্ট। সে আমাকে জানাল যে, সকালে একবার আর সন্ধ্যায় একবার সেল থেকে বের করে কলঘরে নিয়ে যাবে। খাবার পৌঁছে দিয়ে যাবে সেলের মধ্যে। আশেপাশে আরও বন্দী আছে কি না আমাকে জানায়নি, প্রথমে বুঝতেও পারিনি। আমাকে পাহারা দেবার জন্য একজন বন্দুকধারী সিপাই দিনরাত আমার সেলের সামনে পায়চারি করত। দিনের বেলায় ডিউটিতে থাকত কুড়ি-বাইশ বছরের এক জাঠ যুবক, খুব হাসিখুশি। তার গ্রামের কথা, বাড়ির কথা আর সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীর কথা আমাকে ক্রমাগতই বলবার চেষ্টা করত। ভাষাটা সড়গড় না থাকায় সব কথা ঠিক ধরতে পারতাম না, তবে ওরই মধ্যে বেশ ভাল লাগত ওকে।

যেদিন পৌঁছলাম সারাদিন খাওয়া হয়নি। সন্ধ্যায় লালকেল্লার প্রথম ডিনার আমার সামনে রাখা মাত্র বেশ খানিকটা খেয়ে ফেললাম। সারা শরীরটা যেন জ্বলে গেল, ওরকম ঝাল আলু-মটর আমি জীবনে খাইনি। সারা রাত হেঁচকি তুললাম। পরের দিন থেকে সাবধান হয়ে গেলাম।

দিল্লিতে তখনই ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ করেছে। আমার গায়ে তো খদ্দরের জামাকাপড় আর হালকা একটা আলোয়ান। জেলের মোলায়েম কম্বল গায়ে দিয়ে তো সারা শরীরে লাল-লাল চাকা-চাকা দাগ হয়ে গেল।

লালকেল্লায় দিন-দশেক ছিলাম। গোয়েন্দা দফতরের কেউ ঐ কদিন মোটেই দেখা দিলেন না। কলকাতাতেই তো আমার উপর হুকুম জারি হয়েছিল যে আমাকে পাঞ্জাব সরকারের হেপাজতে রাখা হবে। সুতরাং বুঝতে পারলাম, যে-কোনো কারণেই হোক লালকেল্লায় আমাকে সাময়িকভাবে রাখা হয়েছে। জীবন অদ্ভুতভাবে গতানুগতিক। দিনে দুবার সেলের বাইরে নিয়ে যায়, তাছাড়া মাটির তলায় ঐ বন্দিশালায় কেবল "বসে বসে শোনা আপন মর্মবাণী"। বাড়ির কথা মনে হয়, মা'র কথা মনে হয়, রাঙা-কাকাবাবুর কথা মনে হয়, সহকর্মীদের কার কী হল ভাবি, কিন্তু করবার তো কিছু নেই।

বন্দী হিসাবেও তো আমার কতকগুলি অধিকার আছে, যেমন বাড়িতে চিঠি লেখার অধিকার, জীবনযাত্রার জন্য কিছু কাপড়-চোপড় ও জিনিসপত্র পাবার অধিকার, ইত্যাদি। মহম্মদ নাজির এসব বিষয়ে কিছু বলতে পারে না। উপরওয়ালারা জানেন, তাঁরা তাকে কিছু জানাননি।

হঠাৎ একদিন চোখে পড়ে গেল জানলার একধারে কাঠের উপর পেন্সিলে খুব ছোট-ছোট করে এক বন্দী নিজের কথা লিখে গেছে। হংকংয়ে ব্রিটিশ ফৌজে কোনো এক ব্যাটেলিয়নে সে ছিল, নিজের ক্রমিক নম্বরটি সে লিখেছিল। বিদ্রোহের অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করে কোর্ট-মার্শাল করার জন্য ঐ সেলে রাখা হয়েছিল। ভাবলাম লোকটির শেষ পর্যন্ত কী হল কে জানে!

অন্য দিকের সেলের বন্দীকে আমার সেলের সামনে দিয়ে স্নানের ঘরে নিয়ে যেতে হত। সেই সময় চোখাচুখি হত। কথা বলবার খুব একটা চেষ্টা আমি করতাম না, যদিও ভদ্রলোকটির যে কথা বলার খুব ইচ্ছা তা বুঝতে পারতাম। কী জানি কেন একদিন বিকালে মহম্মদ নাজির আমাদের দুজনকে একসঙ্গে সেল থেকে বের করল এবং কিছুক্ষণ সেলের বাইরে একসঙ্গে বসতে দিল। বলল, "একলা আর কত থাকবে, একটু কথা-টথা বলে নাও না, কেউ জানতে পারবে না।" প্রথমেই পরস্পরের নাম বিনিময় হল। আমার নামটা শুনে ভদ্রলোক যেন বেশ বিস্মিতই হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে লালকেল্লায় নিয়ে এসেছে কেন, আমি কি কোনো গোপন বিপ্লবাত্মক কাজের সঙ্গে জড়িত। আমি উত্তরে বলেছিলাম, "ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে আমার একটু-আধটু সম্পর্ক আছে।"

নিজের সম্বন্ধে তিনি জানালেন যে, তিনি পূর্ব-এশিয়া থেকে একটি দলের সঙ্গে সাবমেরিনে করে দেশে এসেছিলেন, আসবার আগে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়েছিল এবং কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা ধরা পড়ে যান। লালকেল্লায় আমাদেরই সেলের উপরে একটি ঘরে তাঁকে তখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তাঁর কথা শুনে আমি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লাম বলাই বাহুল্য।

টি. কে. রাওয়ের দলের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হবার কিছুদিন পরে একদিন উডবার্ন পার্কের বাড়িতে আমার খুড়তুতো দাদা কার্তিক আমাকে বলেন যে, রাঙাকাকাবাবুর পাঠানো একটি দলের লোকেরা এলগিন রোডের বাড়িতে এসেছিল। তাদের সাহায্য করা হচ্ছে এবং কলকাতারই আশেপাশে তারা গোপন কাজকর্ম চালাচ্ছে। আমার মনে হয়েছিল, এলগিন রোডের বাড়ির বেশ কয়েকজন, এমনকী ছোটরাও, ব্যাপারটা জানে। আমি কথাটা চুপচাপ শুনে গিয়েছিলাম, কোনো মন্তব্য করিনি। সুধীর বকসি মহাশয়কে আমি ব্যাপারটা জানাই এবং খোঁজ করতে বলি আরও একটি দল কলকাতায় কাজ করছে কি না। সুধীরবাবু খবর নিয়ে আমাকে বলেন যে, অন্য দলটির যোগাযোগ ও কাজকর্ম সম্বন্ধে জানা গেছে। তবে ঠিক হয়েছে যে, আমাদের দলটিকে সম্পূর্ণ পৃথক করে রাখা হবে এবং আমাদের কাজকর্মের গোপনীয়তা কোনোভাবেই ক্ষুণ্ণ হতে দেওয়া হবে না। এক বছর বাদে মুক্তির পর আমি জানতে পারি যে, যে-ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমার লালকেল্লায় ঘটনাচক্রে দেখা হয়েছিল তিনি নাকি গোপন বিচারে রাজসাক্ষী হয়েছিলেন।

একদিন বিকালে সেলের মধ্যে পায়চারি করছি। দেখি, সিপাই-সান্ত্রি নিয়ে দুজন পুলিশ অফিসার আমার সেলের সামনে হাজির হলেন। অফিসারদের মধ্যে একজন বিরাটকায় শিখ আর একজন কোট-প্যান্ট পরা ছোটখাটো মানুষ। বললেন, তাঁরা

GEMS
ছোট্ট ভালুক আম্মার, নামটি কালু তার,
সাথী সে মোর সব জায়গার, বড় আদরের আম্মার।
যখন কালু লক্ষ্মী হয়ে থাকে, তখন খুব ভালবাসি তাকে,
ও তখন দেয় মিষ্টিমধুর জেমস্ আম্মাকে,
মিষ্টি কালু প্রতি পল মোর মধুর করে রাখে!
স্বপ্ন সুন্দর কত...
জেমস্ আনো পারো যত!
ক্যাডবেরিস্
চকলেটস্
ক্যাডবেরি জেমস্ এমন, মিষ্টিমধুর স্বপ্ন যেমন!

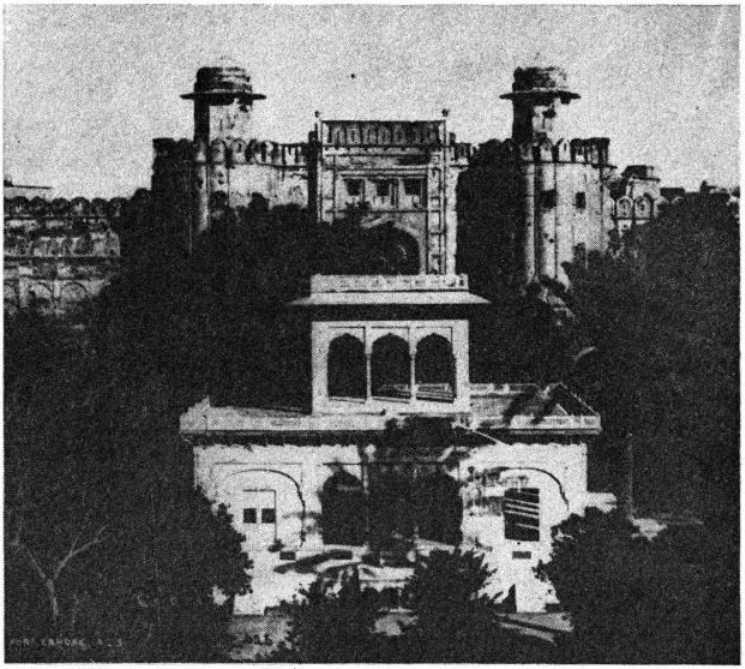

লাহোর ফোর্ট, লেখক যেখানে বন্দী ছিলেন

আমাকে নিতে এসেছেন। এই প্রথম আমাকে হাতকড়া পরানো হল। খুব ভারী লোহার গয়না, দু'হাতে পরিয়ে একসঙ্গে করে চাবি লাগিয়ে দেওয়া হয়। মোটা ভারী চেনটা একটা সিপাই বা অফিসার শক্ত করে ধরে থাকে। আমরা সিঁড়ি বেয়ে মাটির উপরে এলাম। একটি বন্ধ ভ্যানে চাপিয়ে আমাকে এনে ফেলল দিল্লি জংশন স্টেশনে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, দিল্লি স্টেশনে লোক গিজগিজ করছে। যেমন সব সময়ই হয়। আমাকে যখন প্ল্যাটফর্ম দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আমি এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, যদি কোনোমতে একটা চেনামুখ পাই। অন্তত বাড়িতে যদি খবরটা কেউ পৌঁছে দেয়। কিন্তু চেনা মুখ তো নেই-ই, আমাকে যে এভাবে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে তাতে কারুরই মনে কোনো প্রতিক্রিয়া হচ্ছে বলে মনে হল না। ভেবে দুঃখ হল যে, ওদিকে রাঙাকাকাবাবু সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলে দেশের স্বাধীনতার জন্য পাহাড়ে-জঙ্গলে লড়াই করছেন, স্বাধীন সরকার গঠন করেছেন, আর তাঁর দেশের লোক ছোটখাটো ও তুচ্ছ কাজ নিয়ে ব্যস্ত। নিজেকে বড়ই একলা মনে হল। যাই হোক, আমাকে পাঞ্জাব মেলের একটি কুপে কামরায় তুলল। দরজার চাবি পড়ে গেল। আমি ভাবলাম হয়তো হাতকড়াটা এবার খুলে দেবে। অফিসারটি আমার অসুবিধাটা যেন উপলব্ধি করলেন, কিন্তু জানিয়ে দিলেন যে, হাতকড়াটা কোনোমতেই খোলা হবে না, হুকুম আছে। বললেন,"আমরা কী

করব বলুন, বিপ্লবী বন্দীরা সুবিধা পেলেই আমাদের ফাঁকি দিয়ে উধাও হয়ে যান।" বাথরুমে যাব তাও হাতকড়া খুলবে না, দরজার সামনে একজন সিপাই চেনটা ধরে বসে রইল।

ঘুমটা ভাগ্যিস আমার ভাল হয়। ঐ অবস্থায়ও খানিকটা ঘুমিয়ে নিলাম। ঘুমোলেই খানিকটা সোয়াস্তি, ঘুম ভাঙলেই দুঃস্বপ্ন, সে এক অদ্ভুত অবস্থা। সকাল-সকালই ট্রেনটা লাহোরে পৌঁছে গেল। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরে দেখলাম এক শিখ পুলিশ অফিসার আমার কামরার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বলে উঠলেন, "সো দিস ইজ দি ম্যান!" এবার কিন্তু প্রিজন ভ্যানে নয়, একটা টাঙ্গায় আমাকে তোলা হল। আমাকে চালকের পাশে সামনে বসিয়ে হাতকড়াটা ভাল করে মুঠোর মধ্যে নিয়ে সর্দারজি পেছনে বসলেন। কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে! লাহোরের পথের ধুলো উড়িয়ে টাঙ্গার চালক আমাদের লাহোর ফোর্টের ভিতরে একটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড় করাল। সর্দারজি কিছুক্ষণের জন্য ভিতরে গেলেন। পরে বুঝলাম রাস্তা পরিষ্কার আছে কি না দেখতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে টাঙ্গা থেকে আমাকে নামিয়ে এগিয়ে নিয়ে চললেন। একটা বারান্দা পেরিয়ে, একপাশে কতকগুলি ঘর পিছনে ফেলে একটা খোলা ছাদের উপর দিয়ে গিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলাম। গুণ্ডার মতো চেহারার এক পুলিশ অফিসার ইতিমধ্যে আমার ভার নিয়েছেন। বড়সড় একটা চাবি নিয়ে বারো নম্বর সেলের লোহার গেটটা খুললেন। আমাকে ভিতরে নিয়ে হাত-কড়াটা খুলে দিলেন। গেটটা বন্ধ হয়ে গেল। ভাবলাম, যাক, শাজাহানের প্রাসাদ থেকে মুক্তি পেয়ে এবার শাহ আকবরের অতিথি হলাম। (ক্রমশ)

জ্ঞান-বিজ্ঞান

হৃদ্‌রোগীদের জন্য

প্রদীপকুমার দত্ত

ধমনীতে রক্ত জমাট বেঁধে গেলে হৃৎপিণ্ডে রক্তচলাচল বাধা পায় এবং মানুষ করোনারি থ্রমবোসিস রোগে আক্রান্ত হয়। প্রতি বছর এই রোগে কোটি কোটি লোক মারা যায়। সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃদ্‌রোগ-বিশেষজ্ঞ ডঃ উইলিয়াম গ্যানজ জানিয়েছেন যে, তিনি এমন একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন যার দ্বারা ধমনীতে জমাট-বাঁধা রক্ত দ্রবীভূত করে ধমনীর মধ্য দিয়ে রক্ত-চলাচলের বাধা অপসারিত করা যাবে। এর ফলে করোনারি থ্রমবোসিস রোগে মৃত্যুর হার বছর কয়েক পরে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে বলে তিনি মনে করেন। তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে ধমনীর মধ্যে একটি ক্যাথিটার টিউব প্রবেশ করানো হয়। এই টিউবের সাহায্যে একটি ছোট নমনীয় টিউব জমাটবাঁধা রক্তের যতটা কাছাকাছি সম্ভব ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তারপর নমনীয় টিউবটির প্রসারণ ঘটিয়ে জমাটবাঁধা রক্তে আঘাত হানা হয়।—থ্রম্বোলাইসিন নামে একটি ওষুধকে ঐ জমাট-বাঁধা রক্তের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। ওষুধটি প্লাজমিনোজেন নামে একটা এনজাইম উৎপাদন করে। এই এনজাইমটি জমাট রক্তকে তরল করে ধমনীতে রক্ত-চলাচলের পথ পরিষ্কার করে। তবে বুকে ব্যথা অনুভব করার তিন ঘণ্টার মধ্যে পদ্ধতিটি প্রয়োগ করতে না পারলে কোনো কাজ হবে না বলে গ্যানজ জানান।

খানাপিনা

সরল দে

এক যে রাজা খায় না খাজা,
ডবল ডিমের পোচ খায়।
রানীর তাতে ঘেন্না ভারী,
দেখে সে নাক কোঁচকায়।
রাজার লোকে বাজার থেকে
রানীমায়ের ফর্দ দেখে
শুঁটকিমাছের পাহাড় আনে
প্রকাণ্ড এক বোঁচকায়।

এটা-ওটা বায়না করে
খায় না তো রাজকন্যে,
কোর্মা কারি পোলাও-টোলাও
খেতে কি তার মন নেই?
রানী সাধে রাজাও সাধে
কন্যে বলে খানিক বাদে—
"কী আর খাব? ফুচকাওলা
ডাকো আমার জন্যে।"

ছবি: অহিভূষণ মালিক

দরবেশ

ঝুমকা ভাদুড়ী

মিঠাইপাতির লিস্টি কী রে?
দই ল্যাংচা দরবেশ।
বলিস কী রে, বর্তমানে
সবগুলোরই দর বেশ!
সানাইওলা, আলোর মালা
সাজিয়েছে তো ঘর বেশ!
উলু দিচ্ছে শাঁখ বাজছে
দেখতে তো ভাই বর বেশ!
শ্রাবণ মাসের পাগলা হাওয়া
আসছে বাদল-ঝড় বেশ।
বাসরঘরে গাইছে কে রে
কণ্ঠখানির স্বর বেশ!
খাবার পাটটা চুকিয়ে আসি
তুই বাজিটা ধর বেশ—
একাই আমি সাবড়ে দেব
পাঁচ কিলোটাক দরবেশ!

গাবলু
XXX
1-10

নরেন্দ্রপুরের মনোজ

নরেন্দ্রপুর, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের মনোজকুমার পিল্লাই এবার মাধ্যমিকে প্রথম হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অবাঙালি ছাত্রের এতবড় কৃতিত্ব এই প্রথম। প্রধানশিক্ষক স্বামী গিরিজানন্দের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। প্রশান্ত সৌম্য সন্ন্যাসী মনোজের প্রসঙ্গে আনন্দিত হয়ে উঠলেন। বললেন, আজকের দিনে মনোজের মতো ছাত্র বিরল। শুধু পড়াশোনাতেই নয়, ব্যবহারেও সে অনন্য— সরল, বিনয়ী এবং শ্রদ্ধাশীল।

এই নিয়ে পর-পর তিনবার এই স্কুলের ছাত্র প্রথম হল। এখানকার পড়াশোনার পদ্ধতি জানতে চাইলে স্বামীজি বললেন, এখানকার পড়াশোনার পদ্ধতি একটু স্বতন্ত্র রকমের। সকাল ন'টা থেকে বিকেল সওয়া-চারটে পর্যন্ত দুটি শিফ্‌টে ক্লাস হয়। মাঝখানে দেড় ঘন্টা স্নানাহারের অবকাশ। ফলে শেষের দিকের ক্লাসগুলিতে ছাত্ররা ক্লান্ত হয়ে পড়ে না। কোনো ছাত্রের প্রাইভেট টিউটর নেই। সে প্রয়োজনও হয় না। প্রতিটি বিষয়ের পড়া ঐ বিষয়ের শিক্ষকগণ ক্লাসেই তৈরি করে দেন। ন'টি হস্টেলে ন'টি স্টাডি হল আছে। এ ছাড়া স্কুলের সময়ের বাইরেও যে-কোনো ছাত্র যে-কোনো শিক্ষকের কাছে সাহায্য পেতে পারে। লাইব্রেরির রেফারেন্স সেকশনটি ছাত্রদের খুবই সাহায্য করে। এখানে পর্যাপ্ত বই। তাছাড়া দুষ্প্রাপ্য বই আনিয়ে দেবারও ব্যবস্থা আছে। বই নির্বাচনের ব্যাপারে ছাত্ররা শিক্ষকদের সাহায্য পায়। এখানে তিনটি দফায় পরীক্ষা হয়। মাসিক, ষাণ্মাসিক রিভিশন্ টেস্ট ও বার্ষিক পরীক্ষা।

এ-বছর এই স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়েছিল মোট ১২৫ জন ছাত্র। এর মধ্যে ১২২ জন উত্তীর্ণ হয়েছে প্রথম বিভাগে। তিনজন দ্বিতীয় বিভাগে। ৪৮ জন স্টার পেয়েছে। লেটার ৩১৮টি। মনোজ ৭৯৮ পেয়ে প্রথম হয়েছে। কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় পেয়েছে ৭৮২। সে হয়েছে ত্রয়োদশ। মনোজ সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে মেকানিক্সে—৯৮। ওর পড়াশোনার মাধ্যম ইংরেজি, ফার্স্ট ল্যাঙ্গোয়েজ হিন্দি।

চোখে চশমা, ছোটখাটো চেহারার শ্যামবর্ণ কিশোর মনোজের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বুঝতে পারলুম স্বামী গিরিজানন্দ ঠিকই বলেছেন। বিনয়ই মনোজের ভূষণ। ওর চোখেমুখে বুদ্ধির দীপ্তি। কেরালার মাভেলিকারায় মনোজদের আদি বাড়ি। তবে ওরা কলকাতায় আছে বহুদিন। বাবা গোপালকৃষ্ণ পিল্লাই জয়েন্ট প্ল্যান্ট কমিটিতে কাজ করেন। মা জে· কৃষ্ণাম্মা। ছোট বোন মিনি বিদ্যাভারতী গার্লস হাইস্কুলের সেভেনের ছাত্রী। পড়াশোনার ব্যাপারে জানতে চাইলে মনোজ খাঁটি বাংলায় বলল, এ-ব্যাপারে সমস্ত অবদান নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের। প্রথমেই বলতে হয় হাউজ মাস্টার স্বামী দেবেন্দ্রানন্দের কথা। সেই সঙ্গে ভূগোলের শিক্ষক বাসব ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রপুর কলেজের লাইফ সায়েন্সের অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র মাইতি ও ইতিহাসের অমিতাভ চৌধুরীর কথাও বলতে হয়। মনোজ মুখস্থ-বিদ্যাকে খুব বেশি প্রাধান্য দেয়নি। টেক্সট্ বইগুলি খুঁটিয়ে পড়েছে। আর পড়েছে অজস্র রেফারেন্স বই। বাজারচলতি যাবতীয় নোটবইগুলিকে সে সযত্নে এড়িয়ে গেছে।

মনোজ মনে করে সাহিত্যে ভাল নম্বর পেতে গেলে ভাষার দিকে নজর দেওয়া উচিত। আর ব্যাকরণটাও নির্ভুলভাবে শিখে নিতে হবে। টেস্ট পরীক্ষা পর্যন্ত তার লেখার স্পিড ছিল কম। তাই টেস্টের

পরেই সে এ-ব্যাপারে সচেতন ও সচেষ্ট হয়ে উঠল। প্রত্যেকদিন টেস্টপেপার থেকে এক-একটা বিষয়ের প্রশ্ন নিয়ে সল্‌ভ করতে বসত, যেন সত্যিই পরীক্ষা দিতে বসেছে। সামনে থাকত ঘড়ি। হাউজ মাস্টার স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ পরীক্ষা দেওয়াতেন। তিন ঘন্টা পর খাতা টেনে নিতেন তিনি। প্রথম প্রথম সে সমস্ত প্রশ্ন লিখে উঠতে পারত না। বিমর্ষ হত। কিন্তু উদ্যম হারাত না। তিন ঘন্টা পর্যন্ত যতটুকু লিখেছে তার শেষে স্বামীজি লাল কালির রেখা টেনে বলতেন, 'মনোজ, মনে রেখো, এর পর যা তুমি লিখবে তা তিন ঘন্টার বাইরে।' মাস্টারমশাইরা সেই খাতা দেখতেন। নম্বর দিতেন। রাত্তিরটা নির্দিষ্ট থাকত অঙ্ক আর মেকানিক্সের জন্যে। তখন সে দুই থেকে আড়াই ঘন্টার মধ্যেই পেপার

এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে যুগ্মভাবে প্রথম হয়েছে অঞ্জনা সেন ও রুক্মিণী মিত্র। সব মিলিয়ে তারা তৃতীয় স্থানের অধিকারিণী। আগামী সংখ্যায় তোমরা জানতে পারবে, কীভাবে তারা তৈরি হয়েছিল।

শেষ করতে পারত। এই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আস্তে-আস্তে সে স্পিড বাড়াতে সক্ষম হল। মনোজ বলল, চেষ্টার দ্বারা সবই সম্ভব। তার মতে তাড়াতাড়ি লিখলে যে হাতের লেখা খারাপ হয় এ ধারণা ভুল। কী কী বই পড়েছে সে? সে এক দীর্ঘ ফিরিস্তি। তবু কিছু-কিছু বইয়ের কথা বলি। ইংরেজিতে রেন অ্যাণ্ড মার্টিনের গ্রামার। লাইফ সায়েন্সে স্কুলের নোট ছাড়া এ· কে· গাঙ্গুলির 'আউটলাইনস্ অব বোটানি'র দুটি খণ্ড। দুর্গাদাস মুখার্জির দু'খণ্ডের জুলজি। এম· বি· ভি· রবার্টস্-এর 'বায়োলজি এ ফাংশনাল অ্যাপ্রোচ'। ইতিহাসে আর· সি· মজুমদার, এইচ· সি· রায়চৌধুরী এবং কে· কে· দত্তের 'অ্যান অ্যাডভান্স হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া'। আর· সি· মজুমদারের 'হিস্ট্রি অব দি ফ্রিডম মুভমেন্ট

ইন্ ইণ্ডিয়া'র তিনটি খণ্ড। ডি· বসুর 'ইনট্রোডাকশন টু দি কনস্‌টিটিউশন্ অব ইণ্ডিয়া'। প্রভাতাংশু মাইতির 'হিস্ট্রি অব অ্যান্‌সিয়েন্ট ইণ্ডিয়া' ইত্যাদি। ভূগোলে এস· সি· বোসের 'দি হিমালয়ানস'। গোপাল সিং-এর 'এ জিয়োগ্রাফি অব ইণ্ডিয়া'। এ ছাড়া সে ওয়ার্ল্ড জিয়োগ্রাফির নির্বাচিত প্রশ্ন তৈরি করেছিল। ফিজিক্যাল সায়েন্সে পাঠ্য ছিল সি· আর· ডি· জি·-র বই। তা ছাড়া পড়েছিল পি· কে· দত্তের 'ইন্টারমিডিয়েট কেমিস্ট্রি' ও 'ইনঅরগ্যানিক কেমিস্ট্রি'র দুটি খণ্ড। অঙ্কে এক্সাট্রার দিকে তার বরাবরই প্রবল ঝোঁক। হল অ্যাণ্ড নাইটের অ্যালজেব্রা, যাদব চক্রবর্তী ও কে· সি· নাগের এরিথমেটিক ও দাস-মুখার্জির মেকানিক্সের বই তাকে সাহায্য করেছে।

মনোজ ডাক্তার হতে চায়। কেননা সে মনে করে এই পেশায় স্বাধীনতার অবকাশ আছে।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণীকে সে অনুসরণ করতে চেষ্টা করে। স্বামীজি বলতেন, পুঁথিগত শিক্ষাই আসল শিক্ষা নয়, আসল শিক্ষা পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠা।

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ইতালির অধিনায়ক জফ

এই নিয়ে তিনবার

শ্যামসুন্দর ঘোষ

ইতালি শেষ পর্যন্ত ব্রাজিলের রেকর্ড স্পর্শ করল। এতদিন তিনবার বিশ্বকাপ জয়ের অনন্য সম্মানের অধিকারী ছিল শুধু ব্রাজিল। এবার স্পেনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব-কাপ ফাইনালে ইতালি পশ্চিম জার্মানিকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ওই কৃতিত্বের অংশীদার হল

ইতালির প্রশিক্ষক বারজোত

বিশ্ব-কাপের খেলা দেখতে গিয়েছিলাম স্পেনে। ফাইনাল খেলার সেই উত্তেজনা দেশে ফিরে আসার পরেও সম্পূর্ণ থিতিয়ে যায়নি।

ব্রাজিল বিশ্ব-ফুটবলে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান অর্জন করে ১৯৫৮, ১৯৬২ ও ১৯৭০ সালে। ইতালির সাফল্য ১৯৩৪, ১৯৩৮ ও ১৯৮২ সালে।

১৯৭০ সালের মতো এবারও ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দলের কাছেই সুযোগ এসেছিল তিনবারের জন্যে বিশ্ব-কাপ জয় করার। '৭০ সালে মেক্সিকোতে ইতালি ব্রাজিলের কাছে পরাজিত হয়েছিল ১-৪ গোলে। আর ওই সাফল্যের সূত্রে ব্রাজিল চিরদিনের জন্যে জুলে রিমে কাপ নিজেদের দখলে রাখে।

আগের ফাইনালে ব্যর্থ হলেও ইতালি এবার সাফল্য লাভ করেছে। পরাজিত করেছে ১৯৫৪ ও ১৯৭৪ সালের বিশ্ববিজয়ী পশ্চিম জার্মানিকে তবে ইতালির ভাগ্যে জুলে রিমে কাপ জোটেনি। পেয়েছে ফিফা কাপ ও সেইসঙ্গে তিনবার জয়ের মুকুট পশ্চিম জার্মানি এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ফাইনালে হারল পাঠকদের

নিশ্চয়ই স্মরণ আছে ১৯৬৬ সালের কথা। সেবার ফাইনালে ইংল্যাণ্ডের কাছে পশ্চিম জার্মানি হেরেছিল অতিরিক্ত সময়ের গোলে (৪-২)।

১৯৩৪, '৬৬ এবং '৭৮ সালের মতো ফাইনাল খেলা এবার অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত গড়ায়নি। খেলার প্রথমার্ধ গোলশূন্যভাবে শেষ হলেও দ্বিতীয়ার্ধে গোল হয়েছে চারটি। তার মধ্যে প্রথম তিনটি ইতালির এবং শেষ পর্বে জার্মানির একটি। ইতালি অবশ্য প্রথমার্ধে একটি পেনাল্টির সুযোগ নষ্ট করেছিল। ইতালি যোগ্য দল হিসেবে জিতেছে, যদিও প্রথমার্ধে জার্মানির দাপট

পাক্ষিক আনন্দমেলার আগামী সংখ্যায় বিশ্বকাপ ফুটবলের উপরে প্রচুর লেখা ও প্রচুর ছবি থাকবে

ছিল কিছু বেশি। দু-দলই ম্যান-টু-ম্যান মার্কিংয়ের উপর বেশি জোর দিয়েছিল, এবং প্রথমার্ধে ইতালির আক্রমণভাগ কখনোই পশ্চিম জার্মানি রক্ষণভাগের কাছে বিপজ্জনক হয়ে ওঠেনি। খেলায় সব কটি গোলই হয়েছে দর্শনীয়, বিশেষ করে ইতালির দ্বিতীয় গোলটি, এটি বিশ্ব-কাপের মানের পর্যায়ে পড়ে।

ইতালি ও জার্মানির খেলার ফলাফল এ-বছর ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার খেলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ওই খেলায় ব্রাজিল তিন গোলে এগিয়ে থাকার পরে আর্জেন্টিনা একটা গোল করেছিল। সেটা ঘটেছে অন্তিম পর্বে, এবং ব্রাজিলের আত্মতুষ্টির ফলস্বরূপ।

ইতালি ও পশ্চিম জার্মানি ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও প্রাথমিক পর্বে কেউই বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। ইতালি যে এবার বিশ্ব-কাপ জয় করবে, সেটা তাদের অতি বড় সমর্থকও আশা করতে পারেনি। স্পেনে ২৪টি দল নিয়ে গ্রুপ লিগের খেলায় ইতালি যখন তিনটি খেলাই অমীমাংসিতভাবে শেষ করল তখন তাদের সবচেয়ে বড় সমালোচক ছিলেন ওই দেশের সাংবাদিকরা। তিনটি খেলায় ইতালি গোল করেছিল দুটি এবং গোল খেয়েছিল দুটি। ওই দেশের সাংবাদিকদের সম্মানের হানি হয়েছিল যখন তাঁরা দেখেছিলেন, ক্যামেরুনের সঙ্গে ইতালি যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। ক্যামেরুনের দুর্ভাগ্য, ইতালির মতো গ্রুপের তিনটি খেলায় তিন পয়েন্ট পেয়েও গোল-পার্থক্যের জন্যে

গোলের সামনে পাওলো রোসি

ছড়া শুনতে কার না ভালো লাগে বলো ? শুধু কি শোনা, ছড়া মুখস্থ করতেও দারুণ লাগে, তাই না ? আনন্দ পাবলিশার্স থেকে তোমাদের জন্য ছ-ছটা ছড়ার বই বেরিয়েছে। বলতে গেলে, ছড়ায়-ছড়ায় একেবারে ছয়লাপ।

ছয়লাপ, নাকি ছয় রকম আলাপ ? ছয় রকমই বটে। অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'হৈ রে বাবুই হৈ' পড়লেই যেমন হইহই করতে ইচ্ছে করে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ছড়া যায় ছড়িয়ে' তেমনি মাথার মধ্যে ঠিক ছড়িয়ে যায়। আবার সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'মিউ-এর জন্য ছড়ানো ছিটোনোয়' চেনা চেনা শব্দ দিয়ে কী মজার মজার মিল, ভাবাই যায় না। ভাবা যায় না, বিমল দাশের ছবিতে আর নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ছড়াতে কী সুন্দর বই 'সাদা বাঘ'! আবার আদিনাথ নাগের 'হিজলজলের দেশে' বা গৌরী ধর্মপালের 'ঘোড়া যায়'—এ দুটো বইও কি কম মজাদার নাকি ? কোন্‌টা যে কোন্‌টার থেকে বেশি ভালো ভেবে কূল পাবে না। সব কটি বইতেই দারুণ দারুণ সব ছবি।

ছ-ছটি ছড়ার বই
অথবা
ছড়ায়-ছড়ায় ছয়লাপ

হৈ রে বাবুই হৈ ॥ অন্নদাশংকর রায় ৬·০০
ছড়া যায় ছড়িয়ে ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র৫·০০
মিউ-এর জন্য ছড়ানো ছিটোনো ॥ সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৬·০০
সাদা বাঘ ॥ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও বিমল দাস ১০·০০
ঘোড়া যায় ॥ গৌরী ধর্মপাল ৬·০০
হিজলজলের দেশে ॥ আদিনাথ নাগ ৬·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯ ফোন ৩৪ ৪৩৬২

(১-১) তারা দ্বিতীয় পর্বে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পায়নি।

ইতালির সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় যখন প্রশিক্ষক এনজো বারজোতের মুণ্ডুপাত করা হচ্ছিল তখন তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর্জেন্টিনার প্রশিক্ষক সিজার লুইস মেনোত্তি।

স্পেনে প্রতিদিন খেলা ভাঙার দু-মিনিটের মধ্যে অংশগ্রহণকারী দল দুটির প্রশিক্ষকদের সাংবাদিকদের সামনে হাজির করানো হত। অবশ্য এই ধরনের সম্মেলনে সব সাংবাদিকের প্রবেশাধিকার ছিল না। এই আসরে উপস্থিত থাকতে হলে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সাংবাদিকদের বিশেষ প্রবেশ-পত্র যোগাড় করতে হত খেলা আরম্ভের দু-ঘন্টা আগে। আমার সৌভাগ্য, বার্সিলোনার সারিকা স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনা বনাম ইতালি এবং ব্রাজিল বনাম আর্জেন্টিনা খেলার শেষে সাংবাদিক

ফুটবলের বিশ্বকাপ

সম্মেলনে উপস্থিত থাকার প্রবেশ-পত্র জুটেছিল। ব্রাজিলের কাছে হারার পরে ইতালির সাংবাদিকরা মেনোত্তির প্রশিক্ষণের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। মেনোত্তিও অবশ্য সাংবাদিকদের পালটা আঘাত হেনেছিলেন। মেনোত্তির জবাব : আপনাদের প্রশিক্ষকের মনোবল বাড়াবার জন্যে যখন সবচেয়ে বেশি সমর্থন প্রয়োজন তখন আপনারাই ছিলেন তাঁর তীব্র সমালোচক। বারজোতের প্রশিক্ষণ-পদ্ধতির সমর্থনে আমি তখন তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। আজ যেই ইতালি জিততে আরম্ভ করল অমনি আপনারা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন।

ইতালি দ্বিতীয় পর্বে চ্যাম্পিয়নের মতোই খেলেছে। আর্জেন্টিনাকে হারিয়েছে ২-১ গোলে, ব্রাজিলের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছে ৩-২ গোলে, এবং সেমি-ফাইনালে পোল্যাণ্ডকে সহজেই পরাজিত করেছে ২-০ গোলে। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ইতালির সাফল্য এই প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রতিযোগিতা শুরু হবার আগে অনেকে আশা করেছিলেন, '৮২ সালে ব্রাজিল আবার বিশ্ব-কাপ জয় করবে। ব্রাজিলের অধিবাসীদেরও সেই ধারণাই ছিল। আর সেই জন্যেই প্রচুর বিমান ভাড়া দিয়ে প্রায় ১৫,০০০ ব্রাজিলবাসী স্পেনে হাজির হয়েছিলেন খেলা দেখতে।

ব্রাজিল হেরেছে নিজের দোষেই, বা বলা যেতে পারে, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস থাকার ফলেই। দু-দুবার পিছিয়ে থেকেও ব্রাজিল গোল পরিশোধ করেছে, কিন্তু রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা হালকা মেজাজে খেলে দলের পতন ডেকে এনেছেন। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ইতালির সবটুকু কৃতিত্ব সুযোগ-সন্ধানী স্ট্রাইকার পাওলো রোসির। রোসি ব্রাজিলের বিরুদ্ধে তিনটি গোলই করেছেন। পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে দুটি গোল তাঁরই। ফাইনালে পেনাল্টির সুযোগ নষ্ট করার পরে দল ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয়ার্ধের

সেই পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর অনুভূতির জন্য...

লাইফবয় পার্সোনাল

নতুন লাইফবয় পার্সোনাল সেই চির পুরাতন লাইফবয়ের মতই ধুলোময়লার বীজাণু দূর করে...এর সুপ্রচুর ফেনা ও মনমাতানো সুগন্ধ আপনাকে এনে দেয় একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর অনুভূতি। তেমনি আকর্ষণীয় এর গড়ন ও মোড়ক। লাইফবয় পার্সোনাল দিয়েই স্নান করুন... আধুনিক যুগের আধুনিক সাবান!

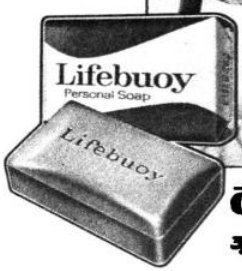

লাইফবয় পার্সোনাল

স্নানে আনে এক অপূর্ব তৃপ্তি

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিন্টাস-LP.40-1812 BG

শুরুতে রোসির দেওয়া প্রথম গোলে দল আবার উজ্জীবিত হয়। রোসি সব মিলিয়ে ছটি গোল করে এই প্রতিযোগিতায় সেরা গোলদাতার সম্মান লাভ করেছেন।

ইতালি বনাম পোল্যাণ্ডের খেলায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার ছাপ ছিল না। জার্মানি বনাম ফ্রান্সের খেলাটি হয়েছে সবচেয়ে উপভোগ্য। বিশ্ব-কাপ ফুটবলের ইতিহাসে এই প্রথম একটি দল ফাইনালে গেল 'সাডেন ডেথ'-এ গোল করার সুযোগে। অনেকে এই খেলাটিকে শতাব্দীর সেরা খেলা বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য অনেকের মতে, এর চেয়েও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ও উঁচুমানের খেলা হয়েছে ১৯৬৬ সালে উত্তর কোরিয়া বনাম পর্তুগালের কোয়ার্টার ফাইনালে, এবং ১৯৭০ সালে ইতালি বনাম পশ্চিম জার্মানি সেমি-ফাইনালে। পর্তুগালের বিরুদ্ধে প্রথম আধ ঘন্টায় কোরিয়া ৩-০ গোলে এগিয়ে গেলেও তাদের হারতে হয়েছিল ৩-৫ গোলে। পর্তুগালের পাঁচটি গোলের মধ্যে চারটি গোল এসেছে 'ব্ল্যাক পান্থার' হিসেবে পরিচিত ইউসোবিওর পা থেকে। '৭০ সালে ইতালি নাটকীয় উত্তেজনার মধ্যে পশ্চিম জার্মানিকে হারিয়েছিল ৪-৩ গোলে।

ফ্রান্স এবার যেভাবে সেমিফাইনালে হেরেছে সেটা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। এই দেশটি একবারও ফাইনালে উঠতে পারেনি। এর আগে তারা আরো একবার সেমি-ফাইনালে উঠেছিল। ১৯৫৮ সালে বিশ্ববিজয়ী ব্রাজিলের কাছে তারা পরাজিত হয়েছিল ২-৫ গোলে।

বিশ্ব-ফুটবলের মূল আসরে ইংল্যাণ্ডই হচ্ছে একমাত্র দল যে-দলটি কোনো খেলাতে না হেরেও প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছে। ওই দলের ব্রায়েন রবসন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি গোল করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ব্রায়েনের গোল এসেছে মাত্র সাতাশ সেকেণ্ডে।

'ম্যান অব দি সিরিজ' কপিল

ইংল্যাণ্ড রাবার জিতল

মণীশ মৌলিক

ওভালেও ড্র, তাই শেষ পর্যন্ত রাবার ইংল্যাণ্ডের হাতেই রয়ে গেল।

তিনটি টেস্টের একটাতেও উইলিস টসে হারেননি। তাঁর 'মুদ্রাভাগ্যটা' চমৎকার বলতেই হবে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ইংল্যাণ্ড ফের বড় রানের ইনিংস গড়েছে। মূল কারিগরের নাম ইয়ান বথাম। প্রথম ডাবল সেনচুরি করেছেন বথাম অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে। এরকম উপভোগ্য ব্যাটিং মরসুমে খুব কমই দেখা গেছে। যতক্ষণ তিনি ক্রিজে ছিলেন ততক্ষণ খেলা ছিল প্রাণবন্ত। এ ম্যাচেই জীবনের প্রথম সেঞ্চুরি পেয়ে অ্যালান ল্যাম নিশ্চয়ই খুব খুশি।

বথামের শটে গোড়ালিতে চোট লেগে গাভাসকর অসুস্থ হয়ে পড়ায় এ-খেলায় ব্যাট করতে পারেননি। নির্ভরযোগ্য বেংসরকরও সুবিধে করতে পারেননি। শাস্ত্রী, বিশ্বনাথ (দুই ইনিংসেই) এবং পাটিল চমৎকার খেলেছেন। বিশ্বনাথ পর-পর তিনটে অর্ধ-শতরান করে বুঝিয়ে দিলেন, এখনো তিনি ফর্মে আছেন। পাটিলের ৬২ রান দলে তাঁর জায়গাকে আরও পাকা করে দিল।

আমার পুরোনো বন্ধু অমলের ছেলেটা আজ ডাক্তারি পাশ করল
ওমা তাই নাকি! অমলের ছেলেটা অবশ্য পড়াশুনোয় খুবই ভাল!
কিন্তু দুঃখের বিষয় ছেলেটার ইচ্ছে ছিল বিলেতে গিয়ে এফ.আর.সি.এস করবার। সেটা হল না। অমল তো কোনদিন কিছু জমায়নি।
সত্যিই কি দুর্ভাগ্য। আমাদের বুবুন যখন বড় হবে তখন ওর যদি বিদেশে পড়বার ইচ্ছে হয় কি করব আমরা!
অমলের ছেলের অবস্থা দেখে শিক্ষা হয়েছে আমার। তাই আমি আজই জনপ্রিয়তে টাকা জমাবার বন্দোবস্ত করছি।
জনপ্রিয়তে অল্প অল্প করে জমা টাকা সুদে আসলে ভবিষ্যতে অনেক হবে। বুবুনের পড়াশুনোর আর কোন ভাবনা থাকবে না।
ভাগ্যিস জনপ্রিয় ছিল। তাই বুবুনের ভবিষ্যতের ব্যাপারে এখন নিশ্চিন্ত হতে পারলাম
তাতাতা, বুবু
ও কি বলছে?
ও বলছে জয় জনপ্রিয়র জয়।
জনপ্রিয় ফাইনান্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
ফোন : ২৪-০৮২৭
রেজিস্টার্ড অফিস : ১৪৭ লেকটাউন বি ব্লক। কলকাতা-৭০০০৮৯
হেড অফিস : ৮/১ এ লিটল রাসেল স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭১
ভারতের সর্বত্র আমাদের ব্রাঞ্চ এবং অর্গানাইজেশন অফিস আছে।

জিমি-জনের যুদ্ধ

অশোক রায়

শেষ পর্যন্ত বর্গই জিতলেন। না, খেলায় নয়, ভবিষ্যদ্বাণীতে। যাঁদের সঙ্গে দীর্ঘ দিন টেনিস কোর্টে ওঠা-বসা, তাঁদের খেলার ধরন-ধারণ ফাঁক-ফোঁকর সবই বর্গের নখদর্পণে। উইম্বলডন শুরু হবার অনেক আগেই এই অসাধারণ খেলোয়াড় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, "কোনর্স এবং নাভ্রাতিলোভা এবার উইম্বলডন জিতবে।"

এ-বছর উইম্বলডন শুরুতেই কিছুটা ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে পড়েছিল। কারণ, বর্গ, লেন্ডল, ক্লার্ক, নোয়া, র‍্যামিরেজরা ছিলেন এবারের আসরে অনুপস্থিত। সুতরাং সেই অর্থে এক এবং দু-নম্বর বাছাই জন ম্যাকেনরো এবং জিমি কোনর্সের ফাইনালে মোলাকাত হবার মতো পরিবেশ গোড়াতেই তৈরি ছিল। সেমি-ফাইনালে ম্যাকেনরো অবাছাই খেলোয়াড় তরুণ টিম মেয়োটকে এবং কোনর্স মার্ক এডমন্ডসনকে হারিয়ে ফাইনালে পরস্পরের মুখোমুখি হলেন। শুরু হল গবেষণার পালা—দুই ন্যাটা আমেরিকানের যুদ্ধে কে জিতবে? গতবারের বর্গ-বিজয়ী ম্যাকেনরো, নাকি দীর্ঘ আট বছর পরে ফাইনালে-ওঠা কোনর্স? প্রশ্নটা বৃষ্টি-বিঘ্নিত সেন্টার কোর্টের দর্শকদের মনেও পাক খাচ্ছিল। পাক্কা তিন ঘন্টা উনত্রিশ মিনিট হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পরে জিমির হাতে হার মানলেন জন ৬-৩, ৩-৬, ৭-৬, ৬-৭, ৪-৬ সেটে। ফলাফলই বলে দেবে ম্যাচের রঙ বদলেছে ক্ষণে ক্ষণে। সেই সঙ্গে উৎকণ্ঠায় দুলিয়েছে খেলোয়াড় এবং দর্শকদের।

মেয়েদের সিঙ্গলস ফাইনালেও মুখোমুখি হয়েছিলেন এক এবং দু-নম্বর বাছাই মার্টিনা

জিমি কোনর্স

নাভ্রাতিলোভা এবং ক্রিস ইভার্ট লয়েড। প্রথম সেটে ইভার্ট গুছিয়ে ওঠার আগেই মাত্র বাইশ মিনিটে ৬-১ ফলাফলে সেট জেতেন নাভ্রাতিলোভা। দ্বিতীয় সেটে সংগ্রামী মানসিকতার পরিচয় দিয়ে ইভার্ট ৬-৩-এ জেতেন। শেষ সেটে নিজস্ব সেরা অস্ত্রগুলো ব্যবহার করে ওঁরা টেনিসকে অনেক উঁচু পর্যায়ে নিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত নাভ্রাতিলোভা জেতেন ৬-২ তে। ক্রিসের বিরুদ্ধে মার্টিনার এটি জয়ের হ্যাট্-ট্রিক। কারণ ১৯৭৮ এবং ৭৯-তে ইভার্টকে হারিয়েই নাভ্রাতিলোভা বিজয়িনীর সম্মান পেয়েছিলেন। একই সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ান, ফরাসি এবং উইম্বলডন জিতে নাভ্রাতিলোভা 'গ্র্যান্ডস্ল্যাম' পাবার পথে পা বাড়ালেন। বাকি রইল আমেরিকান ওপেন জয়।

এবারে মেয়েদের বিভাগে ৩৮ বছর বয়সী বিলি জিন কিং সেমি-ফাইনালে হারলেন ক্রিস ইভার্টের কাছে। ছ'নম্বর বাছাই ওয়েন্ডি টার্নবুলকে হারিয়ে এবং ইভার্টের কাছ থেকে একটি সেট ছিনিয়ে নিয়ে কিং তাঁর ফেলে-আসা ঝক্‌মকে দিনগুলোকে সম্ভবত শেষ বারের মতো মেলে দিয়ে গেলেন দর্শকদের সামনে। উইম্বলডনে এবারের আসরেই শততম ম্যাচ খেলার রেকর্ডটি গড়লেন কিং।

ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান

মণি শর্মা

১০ জুলাই লীগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলায় ইস্টবেঙ্গলের লীগ জয়ের পথে সবচাইতে শক্ত বাধাটি টপকে যাওয়া সম্ভব হয়েছে সুব্রত ভট্টাচার্যের একটি মারাত্মক ভুলের জন্য। ফ্রি-কিক থেকে মোহনবাগানের গোলের সামনে জটলার মধ্যে হঠাৎ পায়ের সামনে বল পেয়ে যান ইস্টবেঙ্গলের পরিশ্রমী ফরোয়ার্ড কার্তিক শেঠ। কোণের দিকে তখন ফাঁকা জাল দেখা যাচ্ছে। সামনে পাহাড়প্রমাণ বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কথা সুব্রতর, কিন্তু তিনি তাঁর জায়গায় নেই। গোলরক্ষক শিবাজি অসহায়। সারাটা খেলায় যে-সুযোগের জন্য মুখিয়ে থাকেন সব ফরোয়ার্ড, সেই সোনার সুযোগ তখন বুটের ডগায়। অবিলম্বে কার্তিক জোরালো শটে ডান দিকের কোণের জালে বল জড়িয়ে দিয়ে ইস্টবেঙ্গলের সামনে লীগ জয়ের রাস্তাটিকে একেবারে সাফ করে দেন।

মোহনবাগানের রক্ষণভাগের বিশ্বস্ত প্রহরী সুব্রত ভট্টাচার্য এ-খেলাকে ভুলে যেতে চাইবেন। কারণ, জীবনে এত খারাপ খেলা তিনি বোধহয় আর কোনো ম্যাচে খেলেননি। বড় ম্যাচের বাঘা ডিফেণ্ডার হিসেবে সুব্রতর খ্যাতি আছে। এদিন কিন্তু সেই সুব্রতকে চেনাই যায়নি। গোটা খেলায় অনেক ভুল করেছেন তিনি। সুরজিৎ বিপজ্জনক, বড় খেলার আগে এ-কথাটা খুব শোনা যায়। কিন্তু এবার তিনি ভাল খেলতে পারেননি। বড় ম্যাচেও তিনি অপ্রতিরোধ্য—এটা প্রমাণ করতে

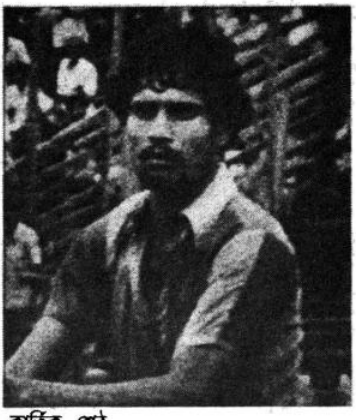

কার্তিক শেঠ

সুরজিতের আর ক'বছর দরকার ? চমৎকার খেলে বিশ্বজিৎ প্রায় কানা করে রেখেছিলেন সুরজিৎকে। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনে ফরোয়ার্ডদের পায়েও তিনি বল জোগাচ্ছিলেন।

মহমেডানের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের মাঝমাঠের অবস্থা ছিল খুবই দুঃখজনক। কিন্তু মোহনবাগানের সঙ্গে খেলার দিন ছবিটা ছিল একদম উলটো। মিহিরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছেন অধিনায়ক অমলরাজ। ওদিকে মোহনবাগানের মাঝমাঠ ছিল নিতান্তই অকেজো। মনোরঞ্জন যে ক্যাম্পে গেছেন, এ-কথা ভুলিয়ে দিয়েছেন পুলক বিশ্বাস। ঠাণ্ডা মাথার আত্মবিশ্বাসী এই খেলোয়াড় ডিপ ডিফেন্সে যে কতখানি প্রয়োজনীয়, তা আর একবার দেখা গেল। পুলকের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল, একাধিক ফুটবল-বিশেষজ্ঞ একথা একবাক্যে স্বীকার করেছেন। সত্যজিৎ ঘোষ সম্পর্কেও তাঁদের ধারণা একই রকমের। এই মরসুমের অন্যতম আবিষ্কার—গোলরক্ষক তাপস চক্রবর্তী। অল্পবয়সী তাপস দু-দুটো বড় ম্যাচে যেরকম খেলেছেন, তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

বাঘা

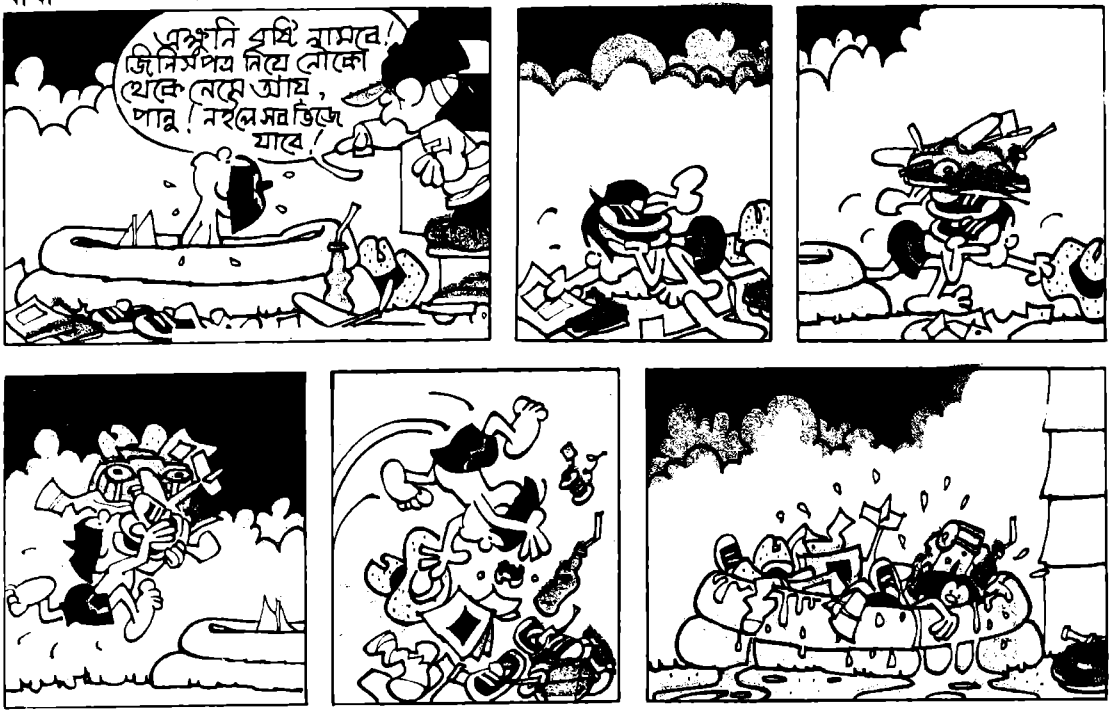

প্রকৃতির এক নতুন আবিষ্কার !

আপনার রঙ এমন ফর্সা করে, যা নজরে পড়ে
...প্রকৃতির বিজস্ব কোমল পদ্ধতিতে !

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী — বিজ্ঞানের এক অভিনব আবিষ্কার—এ এমন এক রঙ ফর্সা করার ক্রীম, যা দুভাবে কাজ করে।

ত্বককে ভেতর থেকে : ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী-র বিশেষ উপাদানগুলি, আপনার ত্বকে ময়লা হওয়ার প্রভাব কম ক'রে দিয়ে, রঙ এমন ফর্সা ক'রে তোলে যা নজরে পড়ে।

ত্বককে বাইরে থেকে : এর বিশেষ 'রোদ এড়ানোর পর্দা' আপনার ত্বককে রোদে পোড়ার হাত থেকে রক্ষা করে, অথচ, ত্বক সূর্য্যকিরণের সমস্ত স্বাস্থ্যকর গুণ শুষে নিতে পারে।

৬ সপ্তাহ ধরে নিয়মিত মাখলে, ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী আপনার রঙ কী ফর্সাই না ক'রে তুলবে— যা আপনি সবসময় চেয়ে এসেছেন।

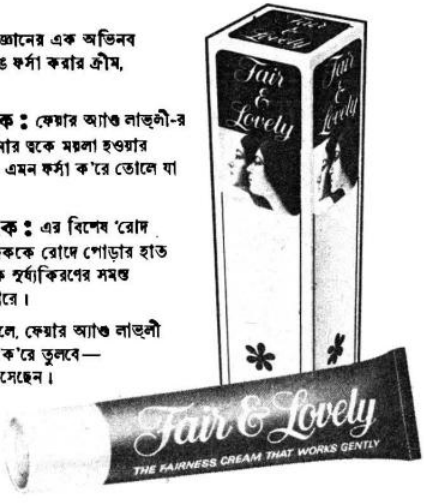

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী — ফর্সা হবার কোমল উপায় !

হিন্দুস্থান লিভারের উৎকৃষ্ট উৎপাদন

LINTAS-FALOV 13. 1810 BG

তোমাদের পাতা

কাকের চালাকি

একদিন আমি শুয়ে-শুয়ে বই পড়ছি। হঠাৎ খুব জোরে মাঁও-মাঁও আওয়াজ শুনে বাইরে তাকালাম। একটা মজার জিনিস দেখলাম।

আমাদের সাদাকালো বেড়ালটা কী যেন একটা খাচ্ছে। তার মুখের দিকে একটা কাক আর লেজের দিকে আর একটা কাক বসে আছে। হঠাৎ লেজের দিকের কাকটা বেড়ালটার লেজে খুব জোরে একটা ঠোকর দিল। বেড়ালটা যেই পেছনের কাকটার দিকে তেড়ে গেছে অমনি সামনের কাকটা বেড়ালের খাবার নিয়ে উড়ে গিয়ে বসল ছাদের কার্নিশে। পরে পেছনের কাকটাও গেল ওখানে। দুজনে মিলে খেতে আরম্ভ করল।

বেচারা বেড়াল মনের দুঃখে গোঁপ চাটতে চাটতে চলে গেল।

সঙ্ঘমিত্রা বসু (বয়স ৮)

শোন্‌রে পাখি

শোন্‌রে পাখি শোন্
আয়রে আমার ঘরে
নাকে নোলক গড়িয়ে দেব
কটা দিনের পরে
আমার সঙ্গী হবি রে তুই
থাকবি টেবিলটাতে
নাচব আমি গানের সুরে
সুর মেলাবি সাথে

পূর্ণিমা দে (বয়স ৬)

ভৌতিক আলো

সনৎ-মেসো শক্তিমান, সাহসী পুরুষ। ভূত-প্রেতকে গ্রাহ্যই করেন না, কিন্তু সে-ঘটনার পরে ভূতে তাঁর বিশ্বাস হয়েছে।

অনেক রাতে সাইকেলে গ্রামের বাড়িতে ফিরছিলেন সনৎ-মেসো। অন্ধকার রাত। সন্ধে থেকে প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। সাইকেলে বাতি নেই।

তিনি স্টেশনের রাস্তা ছেড়ে গ্রামের রাস্তায় পড়লেন। রাস্তায় একটি লোকও নেই। কিছু দূর যেতেই তিনি লক্ষ করলেন—একটা লম্বাটে আলো তাঁর সাইকেলের সামনে, সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। তবে কি পেছন থেকে কেউ আলো ফেলছে? চলন্ত সাইকেল থেকে পেছনে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলেন না। আলো ঠিক সাইকেলের সামনে সামনে চলছে।

আরো কিছু দূর গিয়ে তিনি এবার সাইকেল থেকে নেমে পেছনে দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন—কোনো আলো নেই সাইকেলের সামনে—আশ্চর্য ব্যাপার তো! তিনি এবার সাইকেলে উঠে খুব জোরে চললেন, সেই আলোটাও তেমনি জোরে সাইকেলের সামনে এগিয়ে চলল। এভাবে আরও কিছু দূর যাওয়ার পর তিনি হঠাৎ ব্রেক কষে সাইকেল থেকে নেমে পড়লেন। সেই আলোতেই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন—প্রবল বৃষ্টিতে রাস্তা ভেঙে বিরাট খাদের সৃষ্টি হয়েছে।

সাইকেল ধরে দাঁড়িয়ে সনৎ-মেসো ভাবলেন—চলন্ত সাইকেল নিয়ে বিশ ফুট গর্তে পড়ে যাওয়া বাঁচাতেই কি এই ভৌতিক আলো তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে?

ঋদ্ধিমান মুখোপাধ্যায় (বয়স ১০)

ছবি এঁকেছে রাজীব গুপ্ত (বয়স ৯)

কলা খাও

কলাগাছ দাঁড়িয়ে
আমাদের ছাড়িয়ে
পাকা-পাকা কলা যত
সারি-সারি ঝোলে কত,
পেড়ে শুধু ঝপাঝপ
খেয়ে যাও গপাগপ।

কৌশিক তরফদার (বয়স ৭)

আজকের স্বপ্ন

আমি আজ ঘুমোতে-ঘুমোতে স্বপ্ন দেখলাম আমি যেন জঙ্গলে চলে গেছি। একটা বাড়িতে গেলাম। গিয়ে দেখলাম কত রঙ-বেরঙের ফুল। তারপর সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি একটা স্কুল দেখতে পেলাম। তারপর আমি ছুটতে লাগলাম। ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে এলাম। বাড়ি এসে দেখলাম—মা, বাবা, পিসি—সবাই ঘুমিয়ে আছেন। তাই দেখে আমিও ঘুমোতে গেলাম।

গার্গী সেনগুপ্ত (বয়স ৭)

ছবি এঁকেছে সৌরভ রায়চৌধুরী (বয়স ৮)

রেক্সোনা আপনার ত্বকের যত্ন নেয়...

ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল!

রেক্সোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ—
কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ), লবঙ্গ আর টেরিবিন্থ।
রেক্সোনা মেখে স্নান করুন—এ আপনার ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল। অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে রাখে আপনার প্রিয় সুরাভি...আপনার ত্বকের যত্ন নেবার স্বাভাবিক উপায়!

রেক্সোনা আপনার ত্বকের পক্ষে ভালো

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-RX.78-1812 E

জীবন ও হনু
গোরিলার প্রতিভা দেখে তাজ্জব
এ হচ্ছে কোকো, এক গোরিলা যে কথা বলে…অবশ্য তার হাত দিয়ে! হাত দিয়ে নানা প্রকার ভঙ্গী ক'রে, (যাকে বলে 'সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ') কোকো ইতিমধ্যে তার মতামত জানাতে, বর্ণনা করতে, অনুরোধ করতে, কৌতুক করতে, গুজব ছড়াতে এমনকি মিথ্যা বলতে পারে!
৬½ বছর বয়সেই কোকো ৬৪৫টি 'সাইন' শিখে ফেলেছে। তার মধ্যে সে নিয়মিত প্রায় ৩৭৫টি ব্যবহার করে।
কোকোর বোধশক্তি প্রায় একটি সাধারণ বাচ্চার মতো। তাকে একটি ব্লক, একটি আপেল, একটি জুতা, একটি ফুল ও একটি আইসক্রীমের ছবি দেখানো হয়েছিল—এর মধ্যে খাবার দুটি জিনিষ নিতে বলা হলে সে বেছে নিল আপেল…এবং ফুল!
কোকো মিথ্যে কথা বলতেও ওস্তাদ। একবার তার শিক্ষক লাল ক্রেয়ন চিবোনর জন্যে তাকে তিরস্কার করেছিলেন। কোকো অমনি বলল সে ওটাকে লিপষ্টিক হিসাবে ব্যবহার করছিল—'ঠোঁট'টা দেখিয়েছিল ইঙ্গিত করে।
তাছাড়া সে নতুন নতুন শব্দও বার করেছে। যেমন জেব্রার বদলে 'সাদা বাঘ', হাঁসের বদলে 'জলের পাখী', মুখোসের বদলে 'চোখের টুপী'।
তার কাছে একটা টাইপরাইটার যন্ত্র আছে। তার প্রত্যেকটা 'কী'-র অর্থ হল একটি শব্দ বা বস্তু। কোকো হয়ত টাইপ করল জরুরী এক বার্তা 'চাই আপেল খাই চাই।' যদি শিক্ষক দিতে অস্বীকার করেন, তাঁকে সে অপমান করে নানাভাবে—'নোংরা', 'পচা', বুড়ু ইত্যাদি শব্দে।
কোকো যদি খারাপ ব্যবহার করে, তা'হলে তার শিক্ষক তাকে ঘরের এক কোণে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সে অবিলম্বে বলে 'দুঃখিত' এবং চায় যে শিক্ষক যেন তাকে আদর করেন।
একটা জটিল ক্যামেরাতে কোকো ফটো পর্যন্ত তুলতে পারে। আয়নাতে নিজের প্রতিবিম্বের ছবি তুলতেই সে ভালবাসে এবং বলে ক্যামেরাকে ভালবাসি।
এর পর যদি কাউকে বাঁদর বলে সম্ভাষণ করতে হয়, অন্তত তা করবার আগে ভালভাবে ভেবে দেখো।
জীবন বীমা হ'ল আপনার পরিবারের সুরক্ষার সবচেয়ে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ উপায়। এ সম্পর্কে বিশদ জেনে নিন।
ভারতীয় জীবন বীমা নিগম
daCunha/LIC/126/82